নদী

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

1499
SKM-363

শিশু সাহিত্য সংসদ

গঙ্গা ও তার উপনদী
হিমাচল প্রদেশ
কিমি
০
১৬০
মন্দাকিনী
উত্তরাঞ্চল
অলকানন্দা
যমুনা
দেরাদুন
হরিদ্বার
সাহারানপুর
আলমোরা
পানিপথ
রামগঙ্গা
মীরাট
শোনেপাত
রামপুর
দিল্লী
গাজিয়াবাদ
হরিয়ানা
বেরিলী
গঙ্গা
সারদা
আলিগড়
মথুরা
ভরতপুর
আগ্রা
লক্ষ্মৌ
কাঁচড়াপাড়া
নৈহাটি
চন্দননগর
ভাটপাড়া
ব্যারাকপুর
শ্রীরামপুর
টিটাগড়
পানিহাটি
উত্তরপাড়া
কামারহাটি
বালি
বরানগর
দমদম
হাওড়া
কলকাতা
যাদবপুর
কলকাতার পাশে
হুগলি নদী
রাজস্থান
গোয়ালিয়র
সিন্ধ
কানপুর
যমুনা
চম্বল
বানস
বেতোয়া
কেন
রানাপ্রতাপ সাগর
কালিসিন্ধ
গান্ধী সাগর
ধাসান
মধ্য প্রদেশ
সাতনা
কাটনি
২৪° উ
শিপ্রা
পার্বতী

নেপাল
চীন
সিকিম
ভুটান
উত্তর প্রদেশ
রাপ্তি
ঘর্ঘরা
ফৈজাবাদ
গোরক্ষপুর
বুড়িগণ্ডক
গণ্ডক
গোমতী
মজফ্ফরপুর
দারভাঙ্গা
কোশি
মহানন্দা
বাংলাদেশ
ছাপ্‌ড়া
পাটনা
গঙ্গা
আরা
বারানসী
মির্জাপুর
শোন
পুনপুন
ফল্গু
গয়া
ভাগলপুর
বিহার
পদ্মা
ময়ূরাক্ষী
বরাকর
জলঙ্গী
ভাগীরথী
দামোদর
অজয়
রিহান্দ
উত্তর কোয়েল
পুরুলিয়া
দারকেশ্বর
পশ্চিমবঙ্গ
কাঁসাই
রূপনারায়ণ
হলদি

1499

SHIKSHA MITRA
EDUCATIONAL R[illegible] CENTRE
Supported by : SV[illegible] NIRVAN
62B, ALIPORE ROAD.
KOLKATA-700 027.
PH : 2479 9271
E-MAIL:shikshami[illegible]@[illegible]hoo.co.in

নদী

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শিশু সাহিত্য সংসদ

NADI
(River)
by Dilip Kumar Bandyopadhyay
ISBN 81-85626-44-8

© প্রমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৯৩

শিল্পী : সুদীপ্ত বসু

প্রকাশক
দেবজ্যোতি দত্ত
শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা : লি :
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক
নটরাজ অফসেট
১৭৯এ/১বি মানিকতলা মেন রোড
কলকাতা ৭০০০৫৪

উৎসর্গ—

শ্রীমতী মণিকুন্তলা

শ্রী দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়

পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু

এঁকেবেঁকে বয়ে যাওয়া একটি নদী।

এক

নদীর সঙ্গে পরিচয়

অরণ্য পাহাড় উপত্যকা পেরিয়ে কলকল করে বয়ে যায় নদী। এঁকেবেঁকে বয়ে যাওয়া সেই নদীর মধুর কলতানে কে না মুগ্ধ হয়!

সেই যে ছড়ায় আছে, 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান', অনেকটা ঠিক সেরকম ভাবেই আকাশের মেঘ ঘন হয়ে প্রথম যেদিন টাপুর টুপুর বৃষ্টি নামল, সেদিন থেকেই পৃথিবীর বুকেও বান ডাকল। অর্থাৎ জন্ম হল নদ-নদীর। তারপর থেকে পৃথিবীর পিঠে ছড়িয়ে থাকা ছোট বড় অগুনতি খাত বেয়ে নদীর জল নাচের ছন্দে বয়ে চলেছে। কোনও নদীই থেমে নেই। অনন্তকাল ধরে বয়ে চলেছে সমুদ্রের দিকে।

যে অঞ্চল দিয়ে নদী বয়ে গেছে, তার দুপাশের রুক্ষ পাথুরে প্রান্তর ক্ষয়ে গিয়ে ভরে উঠেছে নদীর নরম উর্বর পলিতে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে রোদ-জল-ঝড়ের ধাক্কায় পাহাড় ভেঙে গুঁড়িয়ে সৃষ্টি হয়েছে মাটির। মাটির ওপরে বেড়ে উঠেছে বিশাল অরণ্য।

নদী মাটি আর অরণ্যের জন্মের অনেক অনেক দিন পরে, আজ থেকে দু-এক লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে এসেছে মানুষ। আর সেই প্রাচীন সময় থেকেই নিজের হরেক রকম কাজে মানুষ ব্যবহার করেছে নদীকে। আরও পরে নদীর দুপাড় ধরে গড়ে উঠেছে মানুষের বসতি, ছবির মতো গ্রাম আর

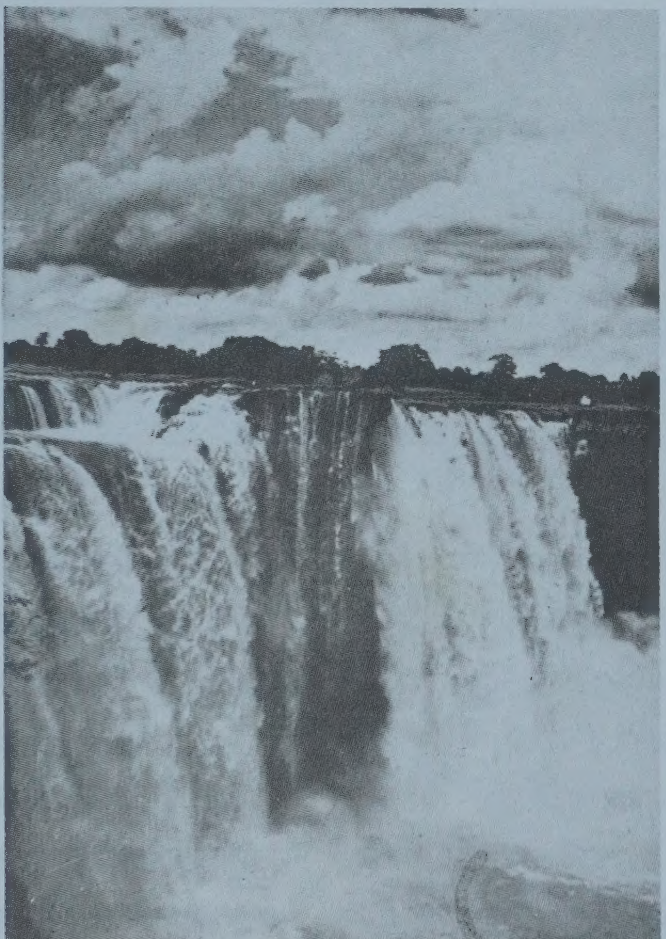

মধ্যপ্রদেশের চিত্রকূট জলপ্রপাত [ছবি : যুধাজিৎ দাশগুপ্ত]

যে অঞ্চল দিয়ে নদী বয়ে গেছে, তা ভরে উঠেছে নদীর নরম উর্বর পলিতে। স্কটল্যাণ্ডের ফোর্থ নদী।

প্রাসাদ-অট্টালিকায় ভরা শহর ও বন্দর। মানুষের সভ্যতাকে এগিয়ে নেবার কাজে নদীর অবদান যে কতখানি, তা শুধু লিখে বোঝানো যাবে না।

নদী আমাদের স্নেহময়ী মায়ের মতো। নদীর জল ছাড়া আমাদের পক্ষে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন। শুধু পানীয় জল নয়, চাষবাসের জলেরও অনেকটাই আমরা পাই নদী থেকে। পৃথিবীতে এমন একটা সময় ছিল যখন যাতায়াতের জন্য মানুষের একমাত্র ভরসা ছিল নদীপথ। এখন অবশ্য নদীপথ ছাড়াও যাতায়াতের অন্য উপায় হয়েছে। এই সব নয়। আধুনিক বিজ্ঞানের দুর্বার জয়যাত্রার দিনে নদীর জলপ্রবাহের উদ্দাম গতিকে কাজে লাগিয়ে অনেক কম খরচে আজকাল তৈরি হচ্ছে জলবিদ্যুৎ (hydel power বা hydro-electricity), যা দিয়ে মেটানো যাচ্ছে বহু কলকারখানা ও গৃহস্থবাড়ির বিদ্যুতের চাহিদা। আসলে ঘর-গেরস্থালির কাজে, কলে-কারখানায়—কোনও জায়গাতেই জল ছাড়া আমাদের এক মুহূর্ত চলে না। আর এভাবেই আমাদের জীবনের নানা প্রয়োজনের সঙ্গে পরতে পরতে জড়িয়ে আছে নদীনালা।

দুই

নদী কেমন করে বয়ে যায়

ভৌগোলিকরা বলেন, বৃষ্টি, ঝরনা আর পাহাড়ের ঠাণ্ডা বরফগলা জল থেকেই প্রথমে জন্ম হয় ছোট ছোট নালা বা ঝোরার। পাশাপাশি বয়ে যাওয়া দু-তিনটি নালা বা ঝোরা মিলেমিশে সৃষ্টি হয় ছোট নদীর। আবার দুটি তিনটি বা আরও বেশি ছোট নদীর মিলন থেকে উৎপত্তি হয় বড় নদীর।

যে জায়গা থেকে নদীর যাত্রা শুরু, ভৌগোলিকরা তাকেই বলেন নদীর উৎস। নদীর উৎস কখনও হিমবাহ, কখনও হ্রদ বা ঝরনা, কখনও বা প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের জায়গা। একটানা চলতে চলতে গতিপথের শেষে যেখানে নদী এসে মেশে সমুদ্র, হ্রদ বা জলাভূমিতে, তার নাম নদীর মোহনা। যেমন, কলকাতার দক্ষিণে ডায়মণ্ড হারবারের পর থেকেই হুগলি নদীর মোহনা শুরু। নদীর উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত নদীর গতিপথের দুপাশের নদীর ক্ষয় থেকে তৈরি ঢালু জায়গাকে বলে নদী-উপত্যকা।

বড় নদীর চলার পথে দুপাশ থেকে যেসব ছোট বা মাঝারি নদী বড় নদীর জলধারার সঙ্গে মেশে, তাদের বলা হয় সেই নদীর উপনদী। নানা উপনদীর জল পেয়ে তবেই না একটা নদী ফুলে ফেঁপে বিরাট হয়ে ওঠে। আর বড় নদী থেকে বেরিয়ে এসে যেসব নদী আলাদা হয়ে সমুদ্র বা হ্রদের জলে মেশে, তারা হল শাখানদী। সেই হিসেবে ক্যানিংয়ের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া মাতলা নদী গঙ্গার (হুগলির) শাখানদী।

নদীর জলধারার কথা তো জানা হল, কিন্তু কাকে বলে দোয়াব? নদীর জন্ম-মৃত্যু জানতে হলে 'দোয়াব'-এর কথাও জানা দরকার। ভৌগোলিকরা বলেন, দুটি বয়ে যাওয়া নদীর মাঝখানের সমভূমিকে বলে দোয়াব। শুনতে একটু খটমট হলেও 'দোয়াব' শব্দের অর্থ কিন্তু জলের মতো পরিষ্কার। ভাষাবিদরা বলেন, দোয়াব (দো=দুই, আব=জল) শব্দের অর্থ দুই দিকে যার জল আর মধ্যিখানে স্থল।

প্রাণী ও গাছপালার জীবনের মতো যে কোনও নদীরই তিনটি অবস্থা। যেমন—তরুণ অবস্থা, পরিণত অবস্থা ও প্রবীণ অবস্থা। এর মধ্যে নদী-উপত্যকার তরতাজা তরুণ অবস্থা দেখা যায় পাহাড়ি অঞ্চলে। আর পরিণত ও প্রবীণ অবস্থা চোখে পড়ে সমভূমি অঞ্চলে।

আমরা সবাই জানি, বেশির ভাগ নদীর উৎসই পাহাড়ি অঞ্চলে। এখানে জমি উঁচু আর ঢাল বেশি বলে নদীর জলে দুরন্ত স্রোত। তাই নদী এখানে চলে লাফিয়ে লাফিয়ে। জলের তোড়ে বয়ে-আনা বড় বড় পাথরের ঘষায় নদীর বুক তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যায়। এই ঘষাঘষিতে নদীর বুকে কোথাও কোথাও তৈরি হয় গোলাকার গর্ত (pot hole)।

দুরন্ত স্রোতে নদীখাত খুব তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যায়

হিমালয়ের পাহাড়ি নদীতে বরফ হয়ে যাওয়া জলপ্রপাত। ছবি : [এইচ এইচ হেডেন। জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার সৌজন্যে।]

বলে পাহাড়ি অঞ্চলে নদী-উপত্যকার চেহারা খুব সরু আর গভীর। অনেকটা ইংরেজি 'আই' (I) অক্ষরের মতো। তাই পাহাড়ি অঞ্চলে প্রায়ই নদীর বুকে সৃষ্টি হয় জলপ্রপাতের।

পাহাড়ি অঞ্চল পেরিয়ে নদী যখন তরতর করে নামতে শুরু করে নিচের দিকে, তখন নদী উপত্যকার চেহারাও বদলাতে থাকে ধীরে ধীরে। পাহাড়ি অঞ্চলের 'আই' (I) অক্ষরের মতো উপত্যকা বেশ চওড়া হয়ে ইংরেজি 'ভি' (V) অক্ষরের মতো চেহারা নেয়। কারণ, এই অবস্থায় নদীর দুই তীরের মাটি খুব তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যায়। তাছাড়া সমভূমিতে নদীর ঢালও বেশ কম। তাই নদী এখানে এগিয়ে চলে খুবই ঢিমে তালে। অনেকটা ঢিলেঢালা বয়স্ক মানুষের ঢঙে।

উঁচু পাহাড় থেকে নদী সমভূমিতে নেমে এলে তার সঙ্গে মেশে অনেক ছোট ছোট নদী। আর তখন নদীর ছিপছিপে চেহারা হয়ে যায় নাদুসনুদুস মোটাসোটা অলস মানুষের মতো। এই অবস্থায় নদীর জলের বেগ কমে যায় বলে নদীগুলি আর বড় বড় পাথর জলের সঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। শুধু ছোট ছোট পলি আর বালিকণা নিয়ে নদী এগিয়ে চলে মোহনার দিকে। আর সঙ্গে সঙ্গে নদীর বুকে জমতে থাকে ছোট আর বড় পাথরের টুকরোগুলো। নদীর এই শেষ পর্যায়ে জলের গতি খুব কম বলে সামান্য বাধা পেলেই নদী এঁকেবেঁকে চলতে থাকে। তবে বাঁক খুব বেশি হলে পুরনো খাত ছেড়ে নদী কখনও কখনও রাস্তা পালটে সোজা পথেই বইতে শুরু করে। ছেড়ে যাওয়া নদীখাতের চেহারা তখন হ্রদ বা বিলের মতো। অনেকটা ঘোড়ার খুরের মতো দেখতে বলে এসব বাঁকা হ্রদের নাম অশ্বখুরাকৃতি (horse-shoe বা ox-bow lake) হ্রদ।

নদী যতই মোহনার দিকে এগোয়, নদী-উপত্যকা ততই চওড়া হতে থাকে। মোহনার কাছে নদী খুব মিহি পলি ও বালি ফেলে। তারপর সেখানে সমুদ্রগর্ভ অল্প অল্প করে উঁচু হলে ক্রমে বালির চর ও দ্বীপ গড়ে ওঠে। তাই নদীখাত এখানে বেশ অগভীরও। ফলে প্রথম দিকে বালির চর ও দ্বীপের পাশ দিয়ে নদীর জল বইতে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে একদিন এই দ্বীপগুলি জুড়ে গিয়ে সৃষ্টি করে নতুন নিচু সমভূমির। মোহনার কাছে নদী এভাবেই জন্ম দেয় নতুন স্থলভাগের। চেহারাটা মাত্রাহীন 'ব'-এর মতো বলে এর নাম বদ্বীপ (delta)। ইংরেজিতে delta শব্দটি এসেছে গ্রিক বর্ণমালার চতুর্থ অক্ষর (△) থেকে। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র আর মেঘনা নদী মিলে বঙ্গোপসাগরের মুখে যে বদ্বীপ সৃষ্টি করেছে, আয়তনে তা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড়। শুধু গঙ্গা নয়, পৃথিবীর অন্য বড় বড় নদীগুলিও, যেমন—নীল, মিসিসিপি-মিসৌরি, ড্যানিয়ুব, সিন্ধু, ইরাবতী, মেকং, ইয়াংসিও মোহনার কাছে বেশ বড় বদ্বীপ সৃষ্টি করেছে।

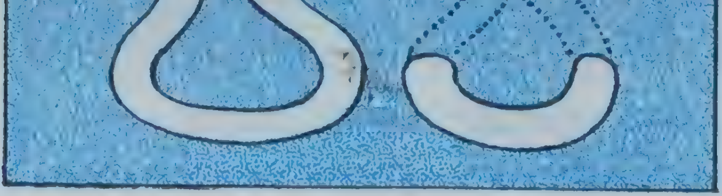

সমভূমির ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলতে চলতে নদী সৃষ্টি করেছে অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ।

তিন

নদী নিয়ে গল্প ও কিংবদন্তী

ভৌগোলিকরা যে যাই বলুন না কেন, নদী শব্দটি উচ্চারণ করলেই আমাদের মনের পটে যে ছবিটা ফুটে ওঠে তা হল, সবুজ-শ্যামল মাঠের ভেতর দিয়ে তিরতির করে বয়ে চলেছে একটা ছোট্ট নদী। বাংলা ভাষায় নদীর নামে অনেক প্রতিশব্দ—তটিনী, তরঙ্গিণী, নির্ঝরিণী, প্রবাহিনী, শৈবলিনী, সরিৎ, স্রোতস্বতী, দ্রবন্তী, স্রবন্তী, পয়স্বিনী ইত্যাদি কত বিচিত্র মধুর শব্দ।

এ তো গেল নদী শব্দের প্রতিরূপের কথা। এবার আসি বিভিন্ন নদনদীর নামের কথায়। সব নদীরই একটা না একটা নাম আছে। আর সেই নামকরণের পেছনে রয়েছে কোনও না কোনও কারণ। কী সেই কারণ?

সব নদীর নামকরণের ইতিহাস জানা না থাকলেও, কিছু কিছু নদীর নামকরণের কাহিনী, ইতিহাস ও কিংবদন্তী জানা গেছে নানা বইপত্র থেকে।

কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা, মিজোরাম থেকে গুজরাট—এই বিরাট ভারতবর্ষের পাহাড় ও প্রান্তর পেরিয়ে বহুকাল ধরে বয়ে চলেছে অসংখ্য নদনদী। কত বিচিত্র এদের নাম। এসব নামের জন্ম-ইতিহাসও খুব অদ্ভুত। কোথাও নদীর নামকরণ ভারতীয় দেবদেবীর নামে, কোথাও নাম এসেছে ঋকবেদ, পৌরাণিক সাহিত্য বা মহাকাব্য থেকে। আবার কোথাও বা নদীর নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নানা মজার গল্প, আশ্চর্য কিংবদন্তী কিংবা ভৌগোলিক পরিচয়।

ভারতের প্রধান নদী গঙ্গা। হিন্দুদের প্রাচীন গ্রন্থ ঋকবেদ, পৌরাণিক সাহিত্য ও মহাকাব্যে রয়েছে গঙ্গানদী সম্পর্কে কত না কাহিনী আর গল্প। তবে

গঙ্গার পাড়ে হৃষিকেশ তীর্থক্ষেত্র। পারাপারের জন্য ঝুলন্ত পুল লছমনঝোলা। [ছবি ঃ মিহির কুন্ডু]

গঙ্গার পাড়ে হরিদ্বার একটি বড় তীর্থ [ছবি ঃ মিহির কুন্ডু]

এগুলি সত্যিই গল্প, এর পেছনে কোনও ভৌগোলিক সত্য নেই। একটি কাহিনীতে রয়েছে, দেবতাদের অনুরোধে পিতা হিমালয় গঙ্গাকে দেবতাদের হাতে দিলে ওঁরা গঙ্গাকে স্বর্গে নিয়ে আসেন। তারপর স্বর্গ থেকে গঙ্গার মর্তে আগমনের কাহিনীটি খুবই কৌতূহল জাগায়। কপিলমুনির শাপে ভস্ম হয়ে যাওয়া সগরপুত্রদের উদ্ধারের জন্য সগর বংশের রাজা ভগীরথ কঠোর তপস্যা করে গঙ্গাকে পৃথিবীতে নিয়ে আসেন। কিন্তু স্বর্গ থেকে মর্তে পড়বার সময় গঙ্গার বিশাল জলধারাকে মাথায় ধরবেন কে? এত শক্তি আছে কার? তাই শেষ পর্যন্ত জটাজুটধারী মহাদেব তাকে মাথায় ধরে রাখলেন। আবার মর্ত থেকে পাতালে যাওয়ার সময় গঙ্গার জলে জহ্নুমুনির যজ্ঞশালা ভেসে গেলে মুনি ক্ষেপে গিয়ে গঙ্গাকে শরবতের মতো পান করে ফেললেন এক চুমুকে। রাগ কমলে পরে অবশ্য কান দিয়ে বের করে দিয়েছিলেন। জহ্নুমুনি পান করে ফেলেছিলেন বলে গঙ্গার অন্য নাম জাহ্নবী।

অন্যদিকে আবার সম্পর্কের দিক থেকে গঙ্গা ভগীরথের মেয়ের মতো। তাই নাম ভাগীরথী। স্বর্গ, মর্ত, পাতাল—এই তিন রাজ্যেই প্রবাহিত বলে গঙ্গাকে ত্রিপথগা নামেও কেউ কেউ ডাকেন।

গঙ্গার উৎপত্তি নিয়েও ভাগবত পুরাণে একটা গল্প আছে। হিন্দু দেবতা বিষ্ণুর বাঁ পায়ের আঙুলের খোঁচাতেই নাকি ব্রহ্মাণ্ডগর্ভ থেকে গঙ্গার জলধারার সৃষ্টি। দেবী ভাগবত আর ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মতে রাধাকৃষ্ণের অঙ্গ ও বিষ্ণুর পা থেকে গঙ্গার জন্ম। তাই গঙ্গার আরেক নাম বিষ্ণুপদী।

গঙ্গার উপনদী ঘর্ঘরা। ঘর্ঘরার উপনদী সরস্বতী নদীর নাম হিন্দু দেবী সরস্বতীর নামে। পুরাণের একটি কাহিনী শোনা যাক। ব্রহ্মা সরস্বতীর রূপে মুগ্ধ হলে সরস্বতী লজ্জায় নিজেকে লুকিয়ে ফেলেন মাটির নিচে। বাস্তবক্ষেত্রেও, সরস্বতী নদী বেশির ভাগ জায়গাতেই ফল্গুনদী হিসেবে মাটির নিচে নিচেই রয়ে গেছে।

মধ্য ভারতের নদী নর্মদা। 'নর্মদা' শব্দের মানে

গভীর নীল জল। কিংবদন্তী আছে, অমরকন্টক পাহাড়ে ব্রহ্মা যখন একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলেন, তখন তাঁর চোখ থেকে ঝরে পড়ে দুফোটা চোখের জল। সেই দুফোটা চোখের জলেই সৃষ্টি হয় দুটি নদীর। পাহাড়ের একপাশে শোন, অন্যপাশে নর্মদা।

দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত নদী কাবেরী। 'কাবেরী' নামটি এসেছে দুটি তামিল শব্দ থেকে। তামিলে 'কা' শব্দের অর্থ বাগান আর 'বেরী' মানে সরোবর। সব মিলিয়ে কাবেরী শব্দের অর্থ বাগানওলা সরোবর। সত্যি সত্যিই কাবেরী নদীর দুপাড় জুড়ে রয়েছে কত চোখ-জুড়োনো ফুলের বাগান। কাবেরী নিয়ে আর একটি কাহিনীও আছে। সেই কাহিনীটি এইরকম। ব্রহ্মা তাঁর কন্যা বিষ্ণুমায়াকে দান করেছিলেন নিঃসন্তান কাবেরন রাজার কাছে। কাবেরনের কন্যা বলে বিষ্ণুমায়ার নতুন নাম হয় কাবেরী। রাজকন্যা হলেও কাবেরীর বিয়ে হয় অগস্ত্য মুনির সঙ্গে। কিন্তু একদিন অগস্ত্য মুনির আশ্রমে ফিরতে দেরি হলে কাবেরী ভেবে বসেন, অগস্ত্যমুনির নিশ্চয়ই দারুণ বিপদ হয়েছে। আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে তিনি একটি পাহাড়ের চূড়া থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েন আশ্রমের সরোবরে। সেই থেকে তিনি নদীর মতো বয়ে চলেছেন কাবেরী নাম নিয়ে।

উত্তর-পশ্চিম ভারত ও পাকিস্তানের প্রধান নদ সিন্ধুর উপনদী শতদ্রুর কথাই ধরা যাক। এই নদীটির তিব্বতি নাম 'লাংচেন খামবাব'। অর্থাৎ হাতির মুখ। কিন্তু এমন অদ্ভুত নামকরণ কেন? আসলে যে হিমবাহ থেকে নদীটির জন্ম তার চেহারা অনেকটা হাতির মুখের মতো। আবার অন্যদিকে পঞ্জাব-হরিয়ানার দুটি শহর নাঙ্গল ও রূপার-এর মাঝখানে শতদ্রু নদীর যে উপত্যকা রয়েছে—তার সংস্কৃত নাম হতৌথ। অর্থাৎ হাতি-উপত্যকা। পরে নদীটির নাম হয় শতদ্রাব। শত মানে একশো, দ্রাব শব্দের অর্থ জলের ধারা। সব মিলিয়ে একশো জলের ধারা। পণ্ডিতরা বলেন, সংস্কৃত শতদ্রাব শব্দ থেকেই শতদ্রু নামটি এসেছে।

রাজস্থানে মরুভূমির ভেতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে লুনি

গঙ্গার বুকে হর-কি-পাউরি। [ছবি ঃ অরূপ মুখোপাধ্যায়]

নদী। এই 'লুনি' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ 'লাভানরী' থেকে। অর্থাৎ নোনা জলের নদী। তামিলনাড়ুর তাম্রপর্ণী নদীর অর্থ তামার জল। নামটা খুবই যুৎসই, কারণ নদীগর্ভে পলির রঙ তামার মতো লাল। কর্ণাটকের মালপ্রভা নদীর নামের অর্থ কাদামাখা। সত্যিই এই নদীতে প্রচুর কাদা। সিলেরু নদীর নামের মানে পাথুরে নদী। আবার শোন নদীর নামের অর্থ সোনা। তাছাড়া শোন নদীর তীরে বালিতেও এককালে সোনা পাওয়া যেত। আবার সুবর্ণরেখা নদীর বালিতে সোনা পাওয়া যায় বলে নদীর নাম সুবর্ণরেখা। বংশধারা নদীর নামের অর্থ বাঁশবনের ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া নদী। সাবরমতী নদীর দুপাড়ে লাফিয়ে বেড়াত বহু সাবর অর্থাৎ হরিণ। তাই এই নাম।

সিন্ধুনদের নামকরণের সঙ্গে পুরনো যুগের ইতিহাসও খানিকটা জড়িয়ে আছে। ঐতিহাসিকরা বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্য থেকে ভারতে এসে আর্যদের প্রথম চোখে পড়ে সিন্ধু নদ। এই নদীটির দু কূল ছাপানো চেহারা দেখে আর্যরা মনে করেছিলেন, এটি নদী নয়, নিশ্চয়ই সাগর অর্থাৎ সিন্ধু। পারসীয় আর্যরা ঠিকঠাক দন্ত্য 'স' উচ্চারণ করতে পারতেন না। তাই ওঁদের উচ্চারণে 'সিন্ধু' শব্দটি শোনাত 'হিন্দু' শব্দের মতো। সেই থেকেই বোধ হয় এদেশের মানুষদের নাম হয়ে গেল হিন্দু।

পাহাড় থেকে নেমে আসা নদী সমুদ্রের কাছে ব-দ্বীপ সৃষ্টি করেছে।

চার

বড় মাঝারি ছোট নদী

সারা দেশ জুড়ে ছোটবড় কত না নদনদীর জাল বিছিয়ে আছে। এদের দৈর্ঘ্য অবশ্য একরকম নয়। কোনোটা লম্বা, কোনোটা ছোট। কোনোটা চওড়া, কোনোটা সরু। কোনোটা গভীর, কোনোটা অগভীর। কোনও নদীর রয়েছে অনেক উপনদী কিংবা শাখানদী। আবার কারও কারও উপনদীর সংখ্যা নেহাতই কম। এই নানা ধরনের নদীর আকার ও আয়তন কীরকম—তা বোঝাবার জন্য ভৌগোলিকরা ভারতের নদীগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। এখানে একটা কথা বলা দরকার। যে অঞ্চলের ভেতর দিয়ে প্রধান নদী ও তার নানা উপনদী ও শাখানদী বয়ে যায়, সেই অঞ্চলকেই বলা হয় মূল বা প্রধান নদীর অববাহিকা।

সাধারণভাবে নদীর দৈর্ঘ্য, জলধারণ ক্ষমতা ও অববাহিকার আয়তনের ভিত্তিতে নদনদীকে বড়, মাঝারি বা ছোট বলা চলে। তবে বিখ্যাত নদী-বিশেষজ্ঞ ডঃ কে. এল. রাওয়ের মত অনুযায়ী, অববাহিকার আয়তন ছোট বড় না মাঝারি, সেই চুলচেরা অঙ্কের হিসেবে ভারতের নদনদীকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন—
(ক) প্রধান বা বড় নদনদী *(খ)* মাঝারি নদনদী *(গ)* ছোট নদনদী।

(ক) প্রথমে বড় নদনদীর কথাই বলা যাক। এসব নদীর অববাহিকার আয়তন ২০,০০০ বর্গ কিলোমিটারের চেয়ে বেশি। ভারতে এমন বড় নদীর সংখ্যা চোদ্দ। এদের নাম *(১)* সিন্ধু *(২)* গঙ্গা *(৩)* ব্রহ্মপুত্র *(৪)* নর্মদা *(৫)* তাপ্তী বা তাপী *(৬)* সাবরমতী *(৭)* মাহী *(৮)* সুবর্ণরেখা *(৯)* ব্রাহ্মণী *(১০)* মহানদী *(১১)* গোদাবরী *(১২)* কৃষ্ণা *(১৩)* কাবেরী *(১৪)* পেন্নার।

(খ) যেসব নদনদীর অববাহিকার আয়তন ২০০০ থেকে ২০,০০০ বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে সে সবই মাঝারি নদনদীর দলে। ভৌগোলিকদের মতে, ভারতে এমন নদনদীর সংখ্যা ৪৪। ওড়িশার বৈতরণী কিংবা কেরালার পেরিয়ার এমন ধরনের নদী। এসব নদী হয়তো গঙ্গার অনেক উপনদীর চেয়ে ছোট, তবে এই নদীগুলি কোনও বড় নদীতে না মিশে সরাসরি পড়েছে সাগরের জলে।

(গ) আর যেসব নদনদীর অববাহিকার আয়তন ২০০০ বর্গ কিলোমিটারের কম, তারাই ছোট নদনদী। ভারতে এমন নদনদীর সংখ্যা ৫৫। ভারতের তটভূমি অঞ্চলেই এ রকম নদীর দেখা মেলে।

ভারতের মাঝারি নদনদী

১. শ্বেতরঞ্জী ২. ভাদর ৩. ধাধার ৪. বুড়িবালাম ৫. বৈতরণী ৬. পূর্ণা ৭. অম্বিকা ৮. বৈতর্ণ ৯. উল্লাস ১০. সাবিত্রী ১১. মাণ্ডভি ১২. কালীনদী ১২. গঙ্গাবলী ১৪. শারাবতী(এর বুকে সৃষ্টি হয়েছে ভারতের সবচেয়ে উঁচু জলপ্রপাত—যোগ বা মহাত্মা গান্ধী ফলস্-২৮৯ মিটার উঁচু) ১৫. নেত্রবতী ১৬. ঘালিয়াব ১৭. ভারতপূজা বা পোন্নানি ১৮. পেরিয়ার ১৯. পাম্বা ২০. রুসিকুল্যা ২১. বংশধারা ২২. শারদা ২৩. ইলেরু ২৪. গুণ্ডলাকাম্মা ২৫. মুসি ২৬. পালেরু ২৭. মুনেরু ২৮. কুনলেরু ২৯. স্বর্ণমুখী ৩০. কোরটালাইয়ার ৩১. পালার ৩২. জিংগি ৩৩. পোন্নাইয়ার ৩৪. ভেল্লার ৩৫. ভাইগাই ৩৬. বর্ষালী ৩৭. কুনদার ৩৮. ভাইপ্পার ৩৯. তাম্রপর্ণি ৪০. কর্ণফুলী ৪১. কালাদান ৪২. ইমফল ৪৩. তিস্কু ননীতালুক।

ভারতের নদনদী

এই বইয়ের নদীর মানচিত্রগুলি আঁকা হয়েছে সেন্ট্রাল বোর্ড ফর দ্য প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল অভ ওয়াটার পলিউশন-এর মানচিত্রের ওপর ভিত্তি করে।

পাঁচ

ভারতের বড় নদনদী

ভারতের উত্তর সীমান্ত জুড়ে রয়েছে বরফে ঢাকা হিমালয় পর্বতমালা। এই পর্বতমালা থেকে যে সব নদনদী বেরিয়েছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় তিনটি নদী হল—সিন্ধু, গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্র। এসব নদীগুলিতে সারা বছরই জল থাকে, কারণ এদের জলের জোগান আসে হিমালয়ের বরফগলা জল থেকে। পাহাড় ধুয়ে প্রচুর মাটি নিয়ে আসে বলে এসব নদীতে পলি প্রচুর। প্রচুর জল থাকায় নদীখাত উপচে এসব নদীতে মাঝে মাঝে বন্যাও হয়। শুধু হিমালয় নয়, দাক্ষিণাত্যের মালভূমি, বিন্ধ্য পর্বত, পশ্চিমঘাট ও পূর্বঘাট পর্বতমালা থেকেও বহু নদীর উৎপত্তি হয়েছে।

সিন্ধু

সিন্ধু নদ ভারত ও পাকিস্তান এই দুই দেশের ভেতর দিয়েই বয়ে গেছে। সিন্ধু নদ বলতে বোঝায় মূল সিন্ধু নদ ও তার কয়েকটি উপনদী। এদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় পশ্চিমদিক থেকে বয়ে আসা কাবুল, স্বাত ও কুরাম আর পুবদিক থেকে আসা ঝিলম, চন্দ্রভাগা (বা চেনাব), রবি, বিপাশা ও শতদ্রু। পুবদিকের এই পাঁচটি উপনদী মিশে জন্ম নিয়েছে পঞ্চনদ। এই পঞ্চনদ সিন্ধুনদের সঙ্গে মিশেছে পাকিস্তানের মাটিতে।

সিন্ধু নদের জন্ম তিব্বতের মানস সরোবর হ্রদের কাছে সেঙ্গে খামবাব ঝরনা থেকে। তাই তিব্বতে সিন্ধু নদের নাম সেঙ্গে খামবাব। উৎপত্তির পর সিন্ধু নদকে পেরোতে হয় উত্তর কাশ্মীর ও গিলগিটের বরফে ঢাকা দুর্গম পর্বত। তারপর পাকিস্তানের নানা উঁচুনিচু পাহাড় পেরিয়ে যে জায়গায় নেমে আসে সবুজ সমতলভূমিতে, তার নাম অ্যাটক। অ্যাটক থেকে শুরু করে আরবসাগরের মুখ পর্যন্ত প্রায় ১৬১০ কিলোমিটার রাস্তা পেরোতে হয় সিন্ধু নদকে। ডেরাগাজীখান, শুক্কর, হায়দ্রাবাদ-এর মতো ছোটবড় অনেক শহরই দাঁড়িয়ে আছে সিন্ধু নদের পাড়ে। উৎস থেকে শুরু করে আরব সাগরের মুখ পর্যন্ত সিন্ধু নদের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ২৯০০ কিলোমিটার।

ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের গবেষণায় জানা গেছে, সিন্ধু নদের অববাহিকায় একটি প্রাচীন অথচ খুবই উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। আর তাই এর নাম সিন্ধু সভ্যতা। অবশ্য এই সভ্যতার আরেক নাম মহেনজোদড়ো-হরপ্পা সভ্যতা, কারণ পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলার মহেনজোদড়ো ও পশ্চিম পঞ্জাবের মুলতান জেলার হরপ্পা—এই দুই প্রাচীন নগরীকে কেন্দ্র করেই বিকাশ ঘটেছিল এই সভ্যতার।

অনেকেরই মনে হয়তো প্রশ্ন উঠবে, এত জায়গা থাকতে সিন্ধু নদের তীরেই বা এই সভ্যতা গড়ে উঠল কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বিশেষজ্ঞরা অন্যান্য কারণের সঙ্গে আরও দু'টি কারণ জুড়ে দিয়েছেন—অঢেল জল ও মাছ। শুধু তাই নয়, সে সময় এ অঞ্চলে নদীর জল বাঁধ দিয়ে ধরে রেখে জলসেচের বন্দোবস্ত হয়েছিল। এছাড়া নদীপথে যাতায়াতেরও খুব সুবিধে ছিল।

কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে ঝিলম নদী। কাশ্মীরের ভেরিনাগ পাহাড় থেকে একটা ছোট ঝরনার আকারে বেরিয়ে এসেছে ঝিলম (আরেক নাম বিতস্তা) নদী। প্রায় ২৫০ বছর আগে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গির এই জায়গাটিকে বাদশাহি কায়দায় খুবই মনোরমভাবে সাজিয়েছিলেন। আজও পর্যটকদের কাছে এটি খুবই পছন্দের জায়গা। ঝিলম নদী কাশ্মীরের চোখ-জুড়োনো সবুজ উপত্যকার ভেতর দিয়ে প্রায় ৪০৭ কিলোমিটার লম্বা আঁকাবাঁকা পথ পার হয়েছে। মাঝে শুধু পীর পঞ্জালের মতো উঁচু পাহাড় আর গা-ছমছম করা গিরিখাত। ঝিলম নদীর

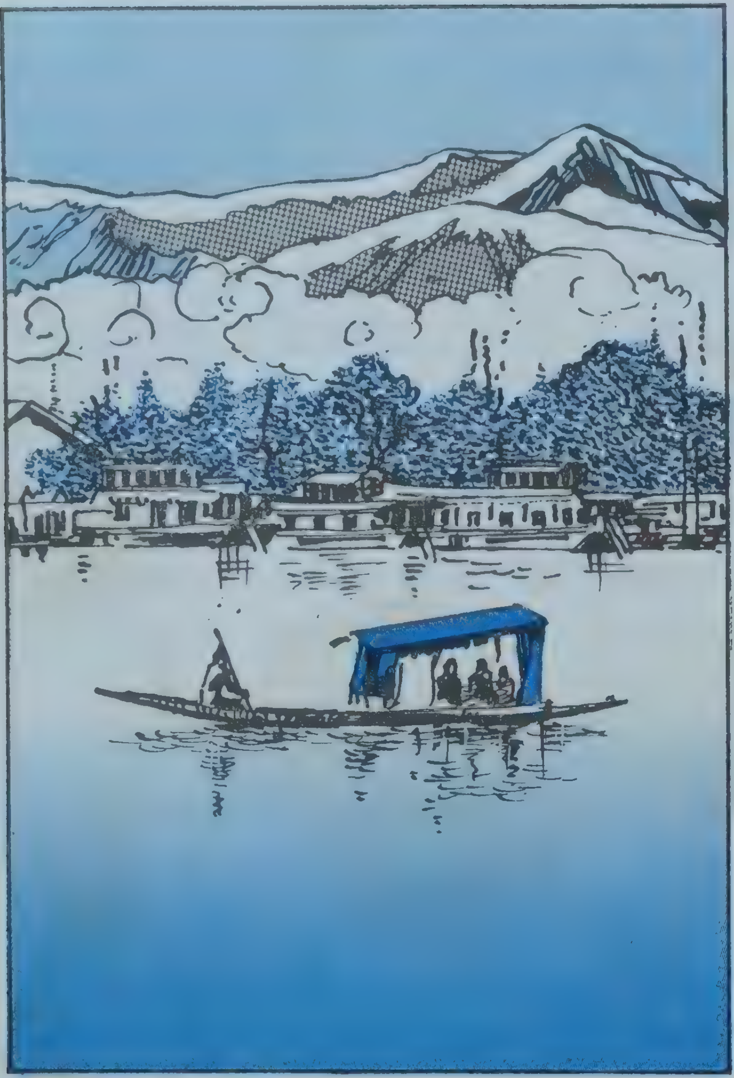

শ্রীনগরের পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ঝিলম নদী।

আবার তিনটি বড় উপনদীও আছে। লিডার, সিন্দ্ ও পোহরু—এই তিনটি উপনদীরই জন্ম কাশ্মীরে। ঝিলম নদী সিন্ধু নদের অন্য উপনদী চেনাবের সঙ্গে মিশেছে পাকিস্তানের ত্রিমু নগরের কাছে।

সিন্ধুর আরেক উপনদী রবির উৎস ভারতেই। হিমাচল প্রদেশের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা কুলু অঞ্চলে জন্মের পর রবি নদী কুলকুল শব্দে বয়ে গেছে পীর পঞ্জাল ও ধৌলাধর পাহাড় দুটির মাঝখান দিয়ে। পরে পাহাড় ছেড়ে দামাল নদী সমতল ভূমিতে নেমে এসেছে পঞ্জাবের মাধোপুরের কাছে। তারপর শিখদের পবিত্র শহর অমৃতসর থেকে ২৬ কিলোমিটার দূরে পাকিস্তানের ভৌগোলিক সীমানার ভেতরে ঢুকে পড়েছে।

বিপাশা নদীর জন্ম হিমাচল প্রদেশের দুর্গম রোটাং গিরিদ্বার (pass) অঞ্চলে প্রায় ৩৯৬০ মিটার উচ্চতায়। তারপর কুলু উপত্যকা পেরিয়ে শতদ্রু নদীতে মিশেছে পঞ্জাবের সমভূমিতে।

১২০০ কিলোমিটার দীর্ঘ চন্দ্রভাগা বা চেনাব সিন্ধুর আরেক উপনদী। রোটাং গিরিদ্বারের উত্তরে হিমাচল প্রদেশের বরফ-ঢাকা দুর্গম লাহুল-স্পিতির পাহাড়ি অঞ্চলে উৎপন্ন চন্দ্র ও ভাগা নদী দুটির মিলিত ধারার নাম চন্দ্রভাগা। হিন্দুদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ কালিকা পুরাণে এই নদীর উল্লেখ রয়েছে। চন্দ্রভাগা খুবই তেজী নদী। তাই অতীতে বেশ কয়েকবার এদিক-ওদিক গতিপথ পালটেছে। সে যাই হোক, ১২৪৫ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে অবশ্য নদীটি পাকিস্তানের মুলতান শহরের পশ্চিমদিক দিয়ে শান্তভাবে বয়ে চলেছে।

কৃষিকাজে চন্দ্রভাগা নদীর অনেক অবদান। এই নদীতে খাল কেটে, তার জল নিয়ে পাকিস্তানের লায়ালপুর ও আশেপাশের প্রায় ৮০,০০০ বর্গ কিলোমিটার রুক্ষ এলাকা এখন উর্বরা ভূমিতে পরিণত হয়েছে। পঞ্চনদের আরেকটি নদী শতদ্রুর জন্ম হিমালয়ের ৪৫৭০ মিটার উঁচু দরমা গিরিদ্বারে।

গঙ্গা

ভারতের বুকের ওপর দিয়ে সেই কত কাল ধরে বয়ে চলেছে প্রায় ২৫১০ কিলোমিটার দীর্ঘ গঙ্গানদী। এই নদী ভারতের হৃদয়ের মতো। প্রায় সারা উত্তর ভারত জুড়ে ছড়িয়ে আছে গঙ্গার অববাহিকা। এই বিরাট অববাহিকার উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত।

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলেছিলেন, 'ভারতের সব নদীর মধ্যে গঙ্গাই শ্রেষ্ঠ। এর বুকে কান পাতলে শোনা যায় ভারতের হৃদয়ের স্পন্দন। তাই তো সভ্যতার শুরু থেকে যুগ যুগ ধরে গঙ্গা নদীর তীরে ছুটে এসেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। ভারতে নানা সাম্রাজ্যের ভাঙা-গড়ার ইতিহাস, নগরের উত্থান পতন, নানা মনীষীর চিন্তা-ভাবনা, জীবনের সুখ-দুঃখ, মানুষের জন্ম-মৃত্যু

সবই জড়িয়ে আছে এই নদীর প্রবাহের সঙ্গে।'

ভারতের ভৌগোলিক আয়তনের শতকরা মাত্র বারো ভাগ এলাকা জুড়ে রয়েছে গঙ্গা সমভূমি। কিন্তু সারা দেশের জনসংখ্যার শতকরা পঁচিশ ভাগের বেশি মানুষ এই গঙ্গা-সমভূমির বাসিন্দা। তাঁদের জীবনের সুখ-দুঃখ হাসিকান্নার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে গঙ্গা নদী।

নদীর সঙ্গে গঙ্গা নামটি এমনভাবে জুড়ে আছে, যে আশেপাশের অন্য অনেক দেশের নদীও গঙ্গা নামেই পরিচিত। যেমন, শ্রীলঙ্কার সবচেয়ে বড় নদীর নাম 'মহাবলী গঙ্গা'। ইন্দোচীনের একটি নদীর নাম 'মহাগঙ্গা'।

গঙ্গা (বা ভাগীরথী) নদীর উৎপত্তি হিমালয় পর্বতে। উত্তরকাশী জেলার গঙ্গোত্রী থেকে ১৯ কিলোমিটারের মতো দূরে প্রায় ৭০০০ মিটার উঁচু গোমুখে। গোমুখেই রয়েছে সেই বরফের গুহা যেখান থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে আসছে গঙ্গা। তারপর গঙ্গোত্রী ছাড়িয়ে ছুটে চলেছে নিচের দিকে।

দুরন্ত দামাল ভাগীরথীর কোলে উজানের দিকে শেষ আধুনিক শহর উত্তরকাশী। খুবই প্রাচীন শহর। হিন্দুধর্মগ্রন্থ স্কন্দপুরাণে এর নাম বারণাবত। তবে চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ এই শহরের নাম লিখেছেন ব্রহ্মপুর। কেউ কেউ বলেন, মহাভারতের জতুগৃহ নাকি তৈরি হয়েছিল এই উত্তরকাশীতেই। এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার। উৎস কিংবা মোহনার কাছাকাছি কোথাও গঙ্গা নদীর নাম গঙ্গা নয়। গঙ্গোত্রী থেকে বেশ কিছুটা নিচে দেবপ্রয়াগে অলকানন্দা নদীর সঙ্গে ভাগীরথীর মিলন হবার পর থেকে এর নাম গঙ্গা।

অলকানন্দার উৎপত্তি অবশ্য উত্তরাঞ্চল গাড়োয়াল জেলা ও তিব্বতের সীমানায়, হিমালয়ের দুর্গম পাহাড়ি জায়গায়, সতোপন্থ হ্রদ ও ভগীরথ হিমবাহ থেকে, প্রায় ৭৮০০ মিটার উচ্চতায়। কিছুটা নিচে অলকানন্দার সঙ্গে মন্দাকিনী নদীর মিলন হয়েছে রুদ্রপ্রয়াগে। হিমালয়ের পাহাড়ি অঞ্চলে বহু

হিমালয় পর্বত অঞ্চলে বিপাশা নদী।

জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়েছে। অলকানন্দার তীরে বদ্রীনাথ তীর্থ।

পাহাড়ি রাস্তা পেরিয়ে প্রায় ২৫০ কিলোমিটার দূরে হৃষীকেশের কাছে গঙ্গা নদী কলকল করে নেমে আসে সমতল ভূমিতে। দেবতার নামে জায়গাটির নাম হয় হৃষীকেশ। এখানেই গঙ্গা পারাপারের জন্য আছে ঝুলন্ত পুল লছমনঝোলা। কিংবদন্তী আছে, রামায়ণের লক্ষণও নাকি দড়ি দিয়ে পুল তৈরি করে এখানেই গঙ্গা পেরিয়েছিলেন।

হৃষীকেশ থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে গঙ্গার পাড়ে আরেকটি বিখ্যাত তীর্থ হরিদ্বার। শিবালিক পাহাড়ের পায়ের কাছে উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুর জেলায় প্রায় ৩০০ মিটার উঁচুতে হরিদ্বার অর্থাৎ হরির দ্বার। ভারতের সপ্ততীর্থের মধ্যে একটি। পুরাণে অবশ্য এর পরিচয় মায়াপুরী নামে। চিরদিনই হরিদ্বারের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ গঙ্গা। তাই আগে এর নাম ছিল গঙ্গাদ্বার অর্থাৎ গঙ্গার দরজা। এখানে বাঁধ দিয়ে আদি গঙ্গার পথ বদলে প্রায় তিন কিলোমিটার লম্বা কৃত্রিম স্রোত সৃষ্টি করা হয়েছে। সেখানেই তৈরি হয়েছে গঙ্গার বিখ্যাত ঘাট হর-কি-পাউরি।

হরিদ্বার থেকে বেশ কয়েকশো কিলোমিটার দূরে গঙ্গার পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে উত্তরপ্রদেশের সবচেয়ে বড় শিল্পনগরী কানপুর। কাপড়, উল ও চামড়া শিল্পের জন্যই কানপুরের নামডাক। তাছাড়া সিপাহী বিদ্রোহের নানা স্মৃতিতেও ভরা কানপুর শহর। কানপুরের ২৭ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে আর এক হিন্দুতীর্থ বিঠুর। কিংবদন্তী আছে, সৃষ্টির দেবতা ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পর অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন গঙ্গার পাড়ে ব্রহ্মাবর্ত ঘাটে। কার্তিক পূর্ণিমায় মেলা বসে আজও। সামনেই রয়েছে মহাকবি বাল্মীকি মুনির নিরিবিলি আশ্রম তপোবন। এই শান্ত তপোবনে বসেই নাকি রামায়ণ লিখেছেন ঋষি বাল্মীকি। অযোধ্যা ছাড়ার পর সীতাদেবী আশ্রয় নেন এই তপোবনে। অনেকের বিশ্বাস, এই আশ্রমেই লব-কুশের জন্ম।

কানপুর থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার নিচে এলাহাবাদ শহরের কাছে গঙ্গার সঙ্গে মিলন ঘটেছে যমুনা নদীর। প্রাচীনকালের সরস্বতী নদীর মিলনও

গঙ্গার উৎস গোমুখ— এক বরফের গুহা [ছবি : সুধীর ভোরা]

ভাগীরথীর সঙ্গে অলকানন্দার মিলন হয়েছে দেবপ্রয়াগে।

এই শহরের কাছে। তাই এলাহাবাদের আর এক নাম ত্রিবেণী। তবে আর্যদের সময়ে এই শহরের নাম ছিল প্রয়াগ। প্রয়াগ নামের সঙ্গে অনেক পৌরাণিক কাহিনীও জড়িয়ে আছে। রামায়ণেও লেখা আছে প্রয়াগের কথা। মুঘল বাদশাহ আকবর যমুনার তীরে নির্মাণ করেন একটি দুর্গ। ওঁর আমলেই প্রয়াগের নাম বদলে প্রথমে হয় ইলাহাবাদ, তারপর ক্রমে এলাহাবাদ।

এলাহাবাদ থেকে প্রায় ২৪৫ কিলোমিটার দূরে গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে, বরুণা ও অসি নদীর সঙ্গমে গড়ে উঠেছে হিন্দুদের আরেকটি পবিত্র তীর্থ বারাণসী বা কাশী। পৃথিবীর প্রাচীন শহরগুলির মধ্যে বারাণসীর নাম তো প্রথমেই বলতে হবে। হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ উপনিষদ ও পুরাণে কাশীর নাম রয়েছে। কাশী বা বারাণসীর বিশ্বনাথের মন্দির খুবই বিখ্যাত। গঙ্গার পাড়ে দশাশ্বমেধ ঘাট ছেড়ে অল্প একটু এগোলেই বিশ্বনাথের গলি। মাঝারি আকারের মন্দির। দেবতা শিব। দিন-ভর পুজো হয়, সন্ধের সময় হয় আরতি। চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণী পড়ে জানা যায়, সেকালে মন্দিরে যে বিগ্রহ ছিল, সেটি প্রায় একশো হাত উঁচু। কিন্তু ১৯৪৮ সালে গঙ্গার বন্যায় মন্দিরের কিছুটা অংশ ভেঙে পড়ে। গঙ্গার ঘাটের কাছে আলমগির মসজিদটি তৈরি করেছিলেন মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব। কাশীর গঙ্গায় ৩৬৫টি ঘাট আছে। ঘাটগুলি সেকালের রাজা-মহারাজাদের কীর্তি। দক্ষিণে হরিশ্চন্দ্র ঘাট তথা মহাশ্মশান থেকে শুরু আর শেষ উত্তরে মণিকর্ণিকা ঘাটে। তবে পণ্ডিতদের মতে কাশীর গঙ্গার সবচেয়ে সেরা ঘাট দশাশ্বমেধ। কিংবদন্তী আছে, ব্রহ্মার আদেশে কাশীর রাজা দিব্যোদাস নাকি দশটি অশ্ব দিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন রুদ্র সরোবরের তীরে।

বিহারের রাজধানী পাটনা দাঁড়িয়ে আছে গঙ্গার পাড়ে। গঙ্গার দক্ষিণ পাড়ে পনেরো কিলোমিটার লম্বা ছড়ানো শহরটি খুবই সুন্দর। ষোলো শতকে এই

শহরের গোড়াপত্তন করেন সম্রাট শের শাহ। অবশ্য তারও আগে, ভারত-সম্রাট অশোকের রাজধানীও ছিল পাটনার কাছে গঙ্গার পাড়ে পাটলিপুত্রতে। শুধু তাই নয়, মগধ-সম্রাট অজাতশত্রুও খ্রিস্টপূর্ব ছ শতকে রাজত্ব করেছেন এই পাটলিপুত্র শহরেই। গ্রিকদূত মেগাস্থিনিসও লিখে গেছেন সেসব কথা। তবে অতীত দিনের পাটনার ছবি অনেকটাই মুছে গেছে ১৭৭০ ও ১৯৩৪ সালের প্রবল ভূমিকম্পে। পাটনার কাছেই গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে উপনদী শোন।

ভাগলপুরের ৩১ কিলোমিটার উত্তরে গঙ্গার তীরে কাহলগাঁও শহর। তেমন বড় শহর নয়, গ্রাম আর শহরের মাঝামাঝি। আটের শতকে এই শহরের নামডাক ছড়িয়ে পড়ে সারা পৃথিবীতে। কারণ সেই সময় রাজা ধর্মপাল গঙ্গার পাড়ে স্থাপন করেন বিখ্যাত বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়। বিদ্যাচর্চার জন্য পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে ছাত্ররা এখানে আসত। বিখ্যাত চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙও এসেছিলেন এই শহরে। কাহলগাঁওয়ের পর গঙ্গার তীরে বিখ্যাত শহর ভাগলপুর। ভাগলপুর ছাড়িয়ে রাজমহলের কাছে গঙ্গা প্রবেশ করেছে পশ্চিমবঙ্গে। আরও ১০০ কিলোমিটার নিচে গঙ্গা ভাগ হয়ে গেছে দুটি শাখায়। একটি ভাগীরথী, অন্যটি পদ্মা। নিচের দিকে হুগলি শহরের পরে ভাগীরথীর নাম হুগলি।

হুগলি নদীর দুপারে দুটি শহর। কলকাতা ও হাওড়া। কলকাতা থেকে ১২৫ কিলোমিটার বয়ে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে হুগলি নদী। মোহনার কাছে বলে এখানে গঙ্গার স্রোত খুবই কম। সমুদ্রের মোহনা থেকে প্রায় ১২৫ কিলোমিটার উত্তরে হুগলি নদীর তীরে গড়ে উঠছে কলকাতা বন্দর। এটি ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্দর। কিন্তু এর এখন নানা সমস্যা। হুগলি নদীর গভীরতা কমে যাওয়া, আঁকাবাঁকা গতিপথ, মোহনা থেকে বন্দর পর্যন্ত তেরো-চোদ্দটি বড় বড় বালির চড়া (sand bar) ইত্যাদি নানা কারণে বড় জাহাজ আজকাল কলকাতা বন্দর পর্যন্ত আসতে পারে না। তাই হলদি ও হুগলি

নদীর মিলনস্থলে নতুন গড়ে-ওঠা হলদিয়া বন্দর এখন কলকাতার পরিপূরক হিসেবে স্থান করে নিয়েছে।

গঙ্গার অন্য শাখা পদ্মা ভারত ও বাংলাদেশের বেশ কিছুটা সীমানা নির্দেশ করে ঢুকে পড়েছে বাংলাদেশের ভেতরে। বাংলাদেশের ভেতরে প্রায় ২২০ কিলোমিটার বয়ে গিয়ে গোয়ালন্দের কাছে পদ্মার সঙ্গে মিলিত হয়েছে ভারতের ব্রহ্মপুত্র নদ। বাংলাদেশে অবশ্য ব্রহ্মপুত্রের পরিচয় যমুনা নামে। আরও প্রায় ১০০ কিলোমিটার নিচে মেঘনা নদীর সঙ্গে মিলনের পরে পদ্মা মিশেছে বঙ্গোপসাগরে।

যমুনা

সবদিক দিয়ে বিচার করলে ১৩৭৬ কিলোমিটার দীর্ঘ যমুনাকে একটি বড় নদীই বলতে হয়। দৈর্ঘ্যের দিক থেকে এটি কৃষ্ণা নদীর প্রায় সমান। তবু এটি যেহেতু এলাহাবাদের কাছে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে, তাই ভৌগোলিক যুক্তিতে এটি গঙ্গার উপনদী। বলা যায় প্রধান উপনদী। এর উৎস উত্তরাঞ্চলের টেহরি গাড়োয়াল জেলার যমুনোত্রী হিমবাহ থেকে। হিমবাহ থেকে ১১ কিলোমিটার নিচে ছোট্ট পাহাড়ি শহর যমুনোত্রী। এখানে যমের বোন যমুনা মায়ের মন্দির আছে। তিনটি উষ্ণ কুণ্ড আছে যমুনোত্রীতে। একটার জল খুব গরম (৮৭° সে)। টগবগ করে দিনরাত ফুটছে। দ্বিতীয়টি মাঝারি গরম। আর তৃতীয়টি অল্প গরম, তাই বহু তীর্থযাত্রী চান করেন এখানে।

ভারতের রাজধানী দিল্লি শহরও গড়ে উঠেছে যমুনার তীরে। মহাভারতের পাণ্ডবেরা রাজত্ব করে গেছেন এই শহরে। তখন অবশ্য এর নাম ছিল ইন্দ্রপ্রস্থ। দিল্লিতে যমুনার তীরে মুঘল সম্রাট শাজাহান গড়ে তুললেন জমকালো এক বিরাট দুর্গ। মুঘলী স্থাপত্যে তৈরি লাল বেলেপাথরের এই দুর্গের নাম লালকেল্লা। ১৬৩৯ সালে শুরু হয়ে ১৬৭৪-এ দুর্গ

হৃষিকেশ আর হরিদ্বারের মাঝখানে গঙ্গানদী। [ছবি ঃ মিহির কুন্ডু]

যমুনার তীরে তাজমহল

তৈরির কাজ শেষ হয়। দুর্গের নির্মাণশৈলীও নতুন ধরনের। ৯০ ফুট উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা কেল্লার চারপাশে ৩০ ফুট গভীর পরিখা।

যমুনার পাড়ে গড়ে উঠেছে আরেকটি বিখ্যাত শহর আগ্রা। আগ্রাও বেশ প্রাচীন শহর। আফগানরাজ সিকন্দর লোদী ১৫০১ সালে তাঁর সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন আগ্রায়। মুঘল সম্রাট আকবর আগ্রা জয় করেন ১৫২৬ সালে। আর আগ্রাকে বিশ্বখ্যাত করেন সম্রাট শাজাহান। তাঁর স্ত্রী মমতাজের স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করে রাখবার জন্য আগ্রায় যমুনার তীরে নির্মিত হয় অতুলনীয় সৌন্দর্যের স্মৃতিসৌধ তাজমহল।

গোমতী

উত্তরপ্রদেশের পিলভিট নগরের তিন কিলোমিটার পুবে, হিমালয়ের পায়ের কাছে নিচু পাহাড়ি জায়গায় গোমতীর জন্ম। উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লখনৌ শহরকে চিরে মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে মাঝারি চওড়া গোমতী নদী। লখনৌ শহরের দু অংশের মধ্যে যোগাযোগের জন্য গোমতী নদীর ওপর কয়েকটি সেতুও নির্মিত হয়েছে। গোমতী গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে বারাণসী থেকে ৩০ কিলোমিটার নিচে।

ঘর্ঘরা

গঙ্গার উপনদী ঘর্ঘরার জন্ম শান্ত নির্জন মানস সরোবরের কাছে। নদীটি তিব্বত থেকে নেপালে প্রবেশ করলে নাম হয় মানছু আর কারনালি। এর একটি উপনদী শারদা বয়ে গেছে ভারত ও নেপাল—এই দুই দেশের কিছুটা সীমানা ধরে। ভারতের ভেতরে ঘর্ঘরার একটি উপনদীর নাম সরযূ—যার তীরে দাঁড়িয়ে ছিল রামায়ণের সেই বিখ্যাত শহর অযোধ্যা। রামায়ণের সরযূ ছিল শান্ত নদী। কিন্তু আজকাল সরযূ নদীতে প্রায়ই বন্যা হয়। বন্যার সময় সরযূ নদীর বিস্তার মাঝে মাঝে পনেরো কিলোমিটার ছাড়িয়ে যায়। এই নদীর জলবহনের ক্ষমতা গঙ্গার বেশির ভাগ উপনদীর চেয়ে বেশি।

বাগমতী

বাগমতী নদীর উৎস নেপালের শিবপুরী পাহাড়ে। নেপালের মহাভারত পর্বত ভেদ করে ভারতে প্রবেশ করেছে বিহারের মজঃফরপুর জেলায়। নেপালের বিখ্যাত পশুপতিনাথ মন্দির দাঁড়িয়ে আছে বাগমতীর পাড়ে।

গণ্ডক

নেপাল সীমান্তের কাছে তিব্বতে প্রায় ৭৬২০ মিটার উচ্চতায় গণ্ডকের জন্ম। সামনে ধৌলগিরি পর্বতশৃঙ্গ। নেপালে এর কয়েকটি উপনদী আছে। যেমন, মায়ানগড়ি, বড়ি, ত্রিশূলী ইত্যাদি। বিহারের ত্রিবেণীতে গণ্ডক নদী পাহাড় থেকে সমতল ভূমিতে নেমে এসেছে। এখানে নদীর বুঁকে একটি বাঁধ তৈরি করা হয়েছে সেচের সুবিধের জন্য।

কোশী

গঙ্গার উপনদীদের মধ্যে সবচেয়ে দুরন্ত বোধ হয় কোশী নদী। নেপালের হিমালয় পাহাড়ে এর জন্ম হয়েছে তিনটি ছোট নদীর আকারে—সান কোশী, অরুণ কোশী ও তামুর কোশী। তামুর কোশী নদীর দুপাশের দেয়াল খুবই খাড়া। আর অরুণ কোশী নদীর অববাহিকার মধ্যেই পড়েছে পৃথিবীবিখ্যাত দুটি পর্বতশৃঙ্গ—এভারেস্ট ও কাঞ্চনজঙ্ঘা। তিনটি উপনদীর মিলনের পর সরু গভীর গিরিখাত ধরে কোশী নদী প্রায় দশ কিলোমিটার পথ এগিয়েছে। তারপর ভারতে প্রবেশ করেছে হনুমান নগরের কাছে। বহুদিন থেকেই দেখা গেছে, কোশী নদী ধীরে ধীরে পশ্চিমদিকে সরে যাচ্ছে। চীনের পীত নদীর (Yellow river) মতো কোশী নদীও নদীখাতের দুই তীর প্লাবিত করে অনেক ক্ষয়ক্ষতি করেছে। ভৌগোলিকরা মাপজোক করে দেখেছেন, বিগত দুশো বছরে কোশী নদী প্রায় ১১২ কিলোমিটার সরে গেছে। কোশী নদী যাতে আর সরে না যায়, সেজন্য হনুমাননগরে কোশীর ওপরে একটি বাঁধও তৈরি করা হয়েছে। কোশী নদী গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে বিহারের কুরসেলায়।

মহানন্দা

২৯০ কিলোমিটার লম্বা নদীটির উৎস দার্জিলিঙ শহরের নিচে ডাও-হিল-এর পাহাড়ি অঞ্চলে। জন্মের পরই পাহাড় থেকে নিচে গড়িয়ে পড়ে কার্শিয়াঙের কাছে সৃষ্টি করেছে এক সুন্দর জলপ্রপাতের। নাম পাগলাঝোরা। বাংলাদেশের ভেতরে পদ্মার সঙ্গে মিশেছে মহানন্দা।

গঙ্গা আর যমুনার মিলন হয়েছে এলাহাবাদ শহরের কাছে। [ছবি ঃ ড. সৌত্রিক বন্দ্যোপাধ্যায়]

চম্বল

চম্বল অবশ্য গঙ্গার উপনদ নয়। এটি যমুনার উপনদ।

চম্বল নদের উৎস মধ্যপ্রদেশের মৌ শহরের কাছে প্রায় ৬০০ মিটার উঁচু জনপাও পর্বতে। এটি মধ্যপ্রদেশের ভিণ্ড, মোরেনা, শিবপুরী, গোয়ালিয়র ও দতিয়া জেলা ও রাজস্থানের বৃষ্টিহীন রুক্ষ অঞ্চলের ভেতর দিয়ে বয়ে গিয়ে যমুনার সঙ্গে মিশেছে এটাওয়া শহরের কাছে। চম্বলের নদীখাতে বর্ষাকালে প্রচুর জল থাকে, কিন্তু অন্যসময় এর খুবই শীর্ণ চেহারা।

চম্বলের উপত্যকা খুবই ভয়ঙ্কর জায়গা। নদীর দু পাড়ে রয়েছে হাজার হাজার দুর্গম গিরিপথ ও গিরিসংকট (খোয়াই)—স্থানীয় ভাষায় যার নাম 'বেহড়'। বেহড় অঞ্চলে ডাকাতি লেগেই আছে। এই বেহড়গুলি ২ থেকে ১৫০ মিটার উঁচু আর তারই নিচে নদীখাত ধরে প্রচণ্ড বেগে বয়ে চলেছে চম্বল। প্রতিবছরই দুরন্ত নদীস্রোতের ক্রমাগত ধাক্কায় নদীপাড় ভেঙে গিয়ে নতুন নতুন বেহড় সৃষ্টি হয়। চম্বল নদীতে বেশ কয়েকটি সুন্দর জলপ্রপাত আছে, যেমন শিবপুরীর কাছে সুলতানগড় ফলস্। খরস্রোতা চম্বল নদে বেশ কয়েকটি বাঁধ দিয়ে পাওয়া যাচ্ছে জলবিদ্যুৎ। সেই জলবিদ্যুৎ পাঠানো হচ্ছে মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে।

শোন

পাটনার কাছে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে উপনদ শোন। জন্ম মধ্যপ্রদেশের শোনভদ্রে, প্রায় ৬০০ মিটার উচ্চতায়। জন্মের পর পাহাড়ি ঢালের ওপর দিয়ে দুরন্ত ঝরনার মতো বয়ে গেছে অনেকটা পথ। শোনের উপনদীদের মধ্যে রয়েছে মহানদী (ওড়িশার বড় নদী নয়), বানাস, রিহন্দ্, কংকর, উত্তর কোয়েল, পুনপুন, কিউল ইত্যাদি। রিহন্দের বুকে বেশ কয়েক বছর আগে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও বড় বাঁধ নির্মিত হয়েছে। রিহন্দ্ বাঁধের জলাধার আয়তনে (১০৬১ কোটি ঘন মিটার) ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বড়।

ময়ূরাক্ষী

ময়ূরাক্ষী নদীর উৎস ঝাড়খণ্ডের সাঁওতাল পরগণার মালভূমিতে, রাজমহল পাহাড়ের দক্ষিণ ঢালে। সাঁওতাল পরগণার উচ্ছল পাহাড়ি নদী ময়ূরাক্ষী, দুমকা শহর পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় প্রবেশ করেছে। ময়ূরাক্ষী নদীতে পশ্চিমবঙ্গ-ঝাড়খণ্ডের সীমানায় মশানজোড়ে (ম্যাসাঞ্জোর) প্রায় দু হাজার ফুট (৬০০ মিটার) লম্বা একটি বাঁধ নির্মিত হয়েছে। এই বাঁধ থেকে জলবিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে।

দামোদর

দামোদরের জন্ম ঝাড়খণ্ডের পালামৌ জেলায়। প্রথমে ঝাড়খণ্ড, পরে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, বর্ধমান ও হাওড়া জেলা পেরিয়ে ফলতার কাছে হুগলি নদীর সঙ্গে মিশেছে। দামোদর নদের অনেকটা অংশই প্রবাহিত হয়েছে কয়লাখনি অঞ্চলের ভেতর দিয়ে। দামোদর নদকে আগে বলা হত 'বাংলার দুঃখ', কারণ প্রতি বছরই বর্ষার সময় অতিরিক্ত জল পেয়ে ফুলেফেঁপে উঠে আশেপাশের গ্রাম নগর ডুবিয়ে দিত দামোদর। দামোদরের এই অভিশাপ থেকে বাঁচবার জন্য ও চাষের জমিতে সেচের জন্য দামোদরের বুকে বেশ কয়েকটি বাঁধ দেওয়া হয়েছে। দামোদরের প্রধান উপনদী বরাকরের উৎস ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগ জেলায়।

রূপনারায়ণ

দ্বারকেশ্বর আর শিলাবতী নদী দুটির মিলনে জন্ম হয়েছে রূপনারায়ণ নদের। এই দুটি নদীরই উৎস ঝাড়খণ্ডের ছোটনাগপুর অঞ্চলে। ডায়মণ্ডহারবারের কিছুটা উত্তরে গাদিয়ারার কাছে হুগলি নদীর সঙ্গে মিশেছে রূপনারায়ণ। গাদিয়ারায় গড়ে উঠেছে এক মনোরম পর্যটন কেন্দ্র।

হলদি

হলদি নদী যেখানে হুগলি নদীর সঙ্গে মিশেছে, ঠিক সেখানেই গড়ে উঠেছে নতুন বন্দর শহর হলদিয়া। হলদি নদীর মোহনায় দাঁড়িয়ে আছে বলে এর নাম হলদিয়া। এটি এখন ভারতের প্রথম শ্রেণীর বন্দর। যেসব বড় জাহাজ হুগলি নদীর অগভীর খাতের জন্য কলকাতা বন্দরে পৌঁছতে পারে না, সেসব জাহাজ হলদিয়া বন্দরে আসে। হলদি নদীর প্রধান উপনদী কাঁসাই বা কংসাবতী। উৎস ছোটনাগপুরের মালভূমিতে পুরুলিয়া জেলায় ঝালদার কাছে। নদীটি বয়ে গেছে বাঁকুড়া জেলার খাতরা ও রানিবাঁধের পাশ দিয়ে। খাতরার কাছে মুকুটমণিপুরে কাঁসাই নদীর ওপর কংসাবতী বাঁধ তৈরি হয়েছে। আর একটি ছোট পাহাড়ি নদী তারাফেণীর জন্ম মেদিনীপুর জেলায়। রানিবাঁধের কাছে এটি মিশেছে কাঁসাই নদীর সঙ্গে। কাঁসাই নদীর জল পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলায় চাষবাসের কাজে লাগছে। কংসাবতী নদীর তীরেই দাঁড়িয়ে আছে মেদিনীপুর শহর।

পদ্মা

বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে গঙ্গার যে শাখা বয়ে যাচ্ছে, তার নাম পদ্মা। প্রায়ই পদ্মার দুপাড় ভেঙে গড়িয়ে পড়ে নদীতে। এভাবে তীরবর্তী বহু গ্রাম, নগর, দালান-কোঠা পদ্মার গর্ভে বিলীন হয়েছে। তাই পদ্মার আর এক নাম কীর্তিনাশা। আসলে, পদ্মা নদীর একদিকে পাড় ভাঙার ফলে নদীর অন্যদিকে চর জেগে উঠছে। নদীর নিয়মই এরকম। যেদিকে স্রোতের চাপ পড়ে সেদিকে ভাঙে, তখন উলটোদিকে চাপ কম বলে বালি আর মাটি জমে জমে জেগে ওঠে চর। বাংলাদেশে ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমায় ভাঙাগড়াটা সবচেয়ে বেশি। পদ্মার তীরে গোয়ালন্দ বিখ্যাত নদী-বন্দর ও ঘাট। আজকাল অবশ্য চর পড়ে গোয়ালন্দ ঘাট

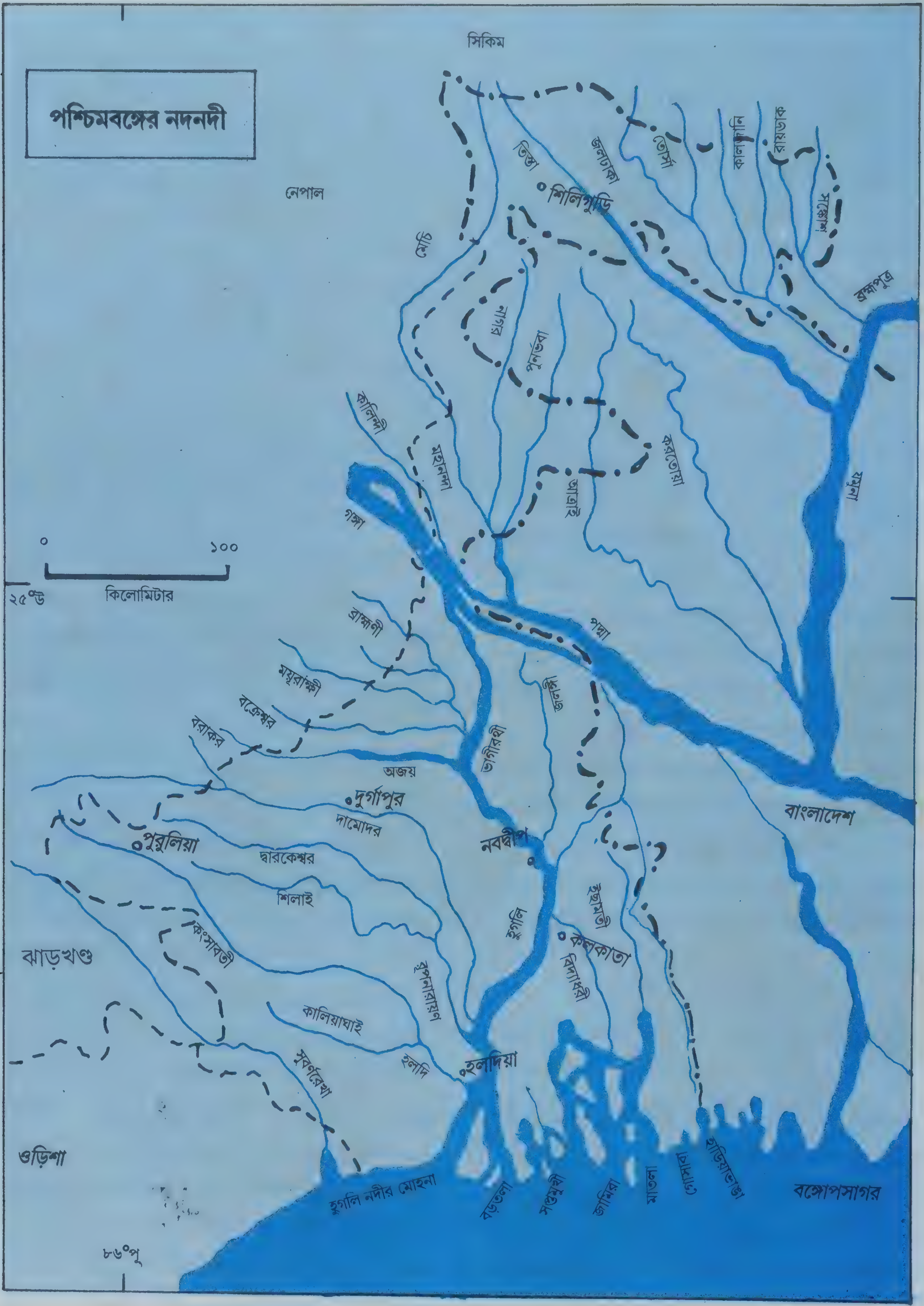
পশ্চিমবঙ্গের নদনদী
সিকিম
নেপাল
তিস্তা
জলঢাকা
তোর্সা
কালজানি
রায়ডাক
সংকোশ
শিলিগুড়ি
মেচি
ব্রহ্মপুত্র
টাঙন
পুনর্ভবা
কালিন্দী
মহানন্দা
আত্রাই
করতোয়া
যমুনা
গঙ্গা
০
১০০
কিলোমিটার
২৫°উ
পদ্মা
ব্রাহ্মণী
ময়ূরাক্ষী
বক্রেশ্বর
বরাকর
অজয়
ভাগীরথী
জলঙ্গি
দুর্গাপুর
দামোদর
বাংলাদেশ
পুরুলিয়া
দ্বারকেশ্বর
নবদ্বীপ
শিলাই
ইছামতী
হুগলি
কলকাতা
ঝাড়খণ্ড
কংসাবতী
রূপনারায়ণ
বিদ্যাধরী
কালিয়াঘাই
হলদি
হলদিয়া
সুবর্ণরেখা
ওড়িশা
হুগলি নদীর মোহনা
বড়তলা
সপ্তমুখী
জামিরা
মাতলা
গোসাবা
হাড়িয়াভাঙা
বঙ্গোপসাগর
৮৬°পূ

দৌলতদিয়ায় সরে গেছে। ফলে গোয়ালন্দের গুরুত্ব কিছুটা কমে গেছে। তাছাড়া পদ্মার পাড়ে লৌহজঙ্গ নামে নতুন আর একটি নদী-বন্দর গড়ে উঠেছে।

দক্ষিণবঙ্গ ও সুন্দরবনের নদনদী

পশ্চিমবঙ্গের পুরনো ও পরিণত বদ্বীপ অঞ্চলে এমন অনেক নদনদী রয়েছে, যেগুলি আগেকার স্রোতধারা হারিয়ে ফেলে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে। যেমন, জলঙ্গী, মাথাভাঙ্গা, চূর্ণী। এসব নদীর কিন্তু এককালে গঙ্গা, ভাগীরথী বা পদ্মার সঙ্গে সংযোগ ছিল। ধীরে ধীরে স্রোতের ধারা বদলে যাওয়ায় এসব এখন মজে যাওয়া নদীর মতো পড়ে আছে।

দক্ষিণবঙ্গের বদ্বীপ বা সুন্দরবন এলাকায় জোয়ারের জলে পরিপুষ্ট বেশ কয়েকটি নদনদী আছে। যেমন, বিদ্যাধরী, পিয়ালী, ইছামতী, মাতলা, গোসাবা, রায়মঙ্গল ইত্যাদি। ভৌগোলিকদের ভাষায়, এগুলো গঙ্গার শাখানদী।

কলকাতার গঙ্গায় সেদিন। [শিল্পী ঃ কোলস্ওয়ার্দি গ্রাণ্ট ১৮১৩-১৮৮০]

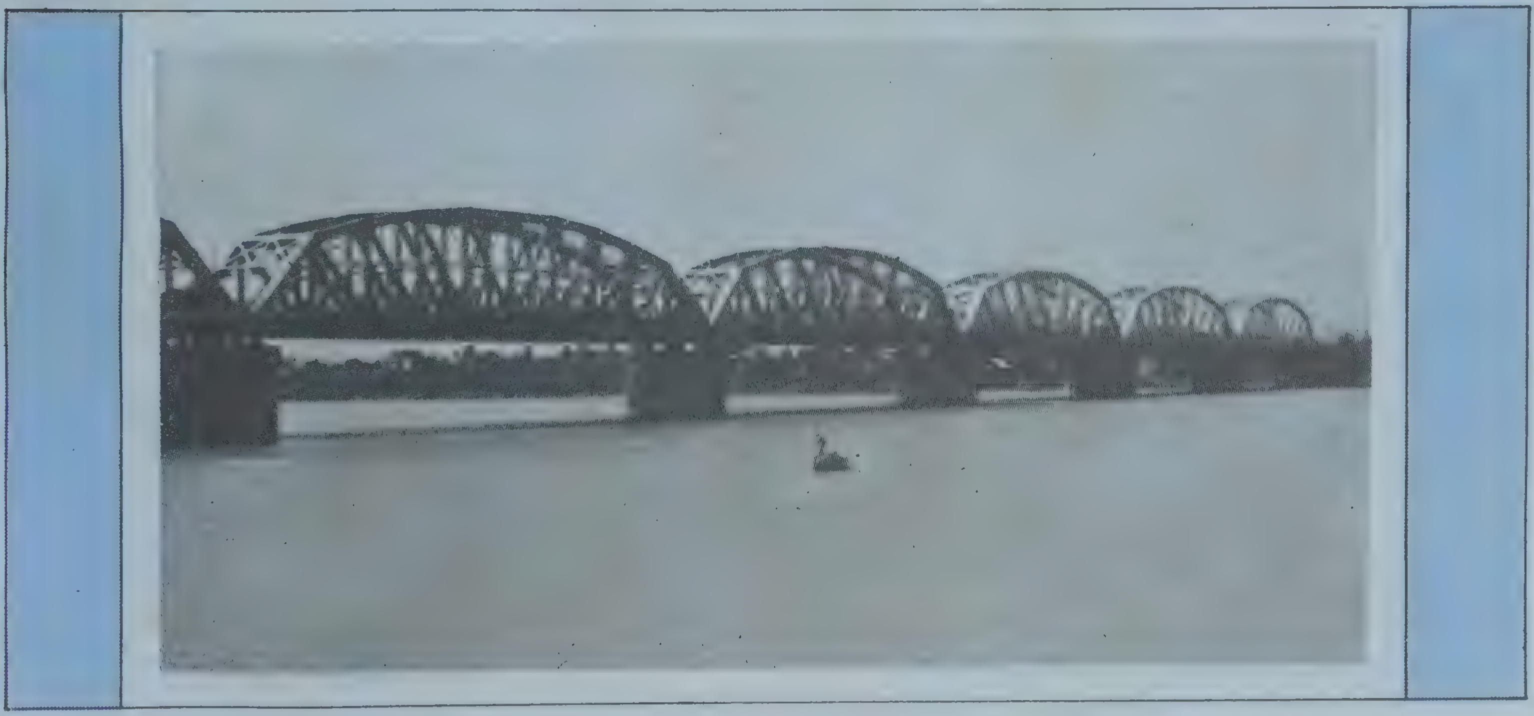

কলকাতার বালী ব্রিজের কাছে গঙ্গা। [ছবি ঃ অরূপ মুখোপাধ্যায়]

তিব্বত, ভারত ও বাংলাদেশ—এই তিনটি দেশের ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া ব্রহ্মপুত্র পৃথিবীর খুবই গুরুত্বপূর্ণ নদী। তিব্বতে ব্রহ্মপুত্র নদের নাম সাংপো। এর অর্থ নদী।১৯১১ সালে ভারতের সার্ভে বিভাগের রিপোর্ট থেকে জানা যায় ব্রহ্মপুত্রের জন্ম মানস সরোবরের কাছে। তবে আধুনিক ভৌগোলিকদের মতে ব্রহ্মপুত্রের জন্ম হিমালয়ের বিখ্যাত চেমায়ুং-দুং হিমবাহ থেকে। তবে কোনও কোনও ভৌগোলিক অবশ্য বলেছেন, সাংপোর উৎপত্তি কুবি হিমবাহ থেকে। উৎসের কাছাকাছি মানস সরোবর হ্রদ ও ব্রহ্মপুত্র নদের মাঝখানে রয়েছে মারিয়াম লা গিরিদ্বার। ব্রহ্মপুত্র নদের দৈর্ঘ্য প্রায় ২৯০০ কিলোমিটার। এর মধ্যে ১৭০০ কিলোমিটার তিব্বতে, ৮০০ কিলোমিটার ভারতে আর বাকিটা বাংলাদেশের ভেতরে।

উৎসমুখ থেকে বেরিয়ে হিমালয়ের উঁচুনিচু পাহাড়ি নদীখাতের ওপর দিয়ে ঝরনার মতো বয়ে গেছে ব্রহ্মপুত্র। তিব্বতের ভেতরে কয়েকটি ছোটবড় পাহাড়ী উপনদী মিশেছে সাংপোর সঙ্গে। যেমন, গাংছু। গাংছু নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে তিব্বতের রাজধানী লাসা।

তিব্বতের ভেতর দিয়ে প্রায় ১৭০০ কিলোমিটার পেরিয়ে সাংপো ঢুকেছে ভারতের অরুণাচল প্রদেশে। ভারতের মাটিতে প্রবেশ করার পর সাংপোর নাম বদলে হয় ডিহাং। পরে সদিয়ার কাছে দুটি উপনদী ডিবাং ও লুহিত-এর সঙ্গে ডিহাং-এর মিলনের পরে সেই মিলিত নদীর নাম ব্রহ্মপুত্র। ৩৬০০ মিটার উঁচু তিব্বত মালভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হলেও সদিয়ার কাছে ব্রহ্মপুত্র হঠাৎ নেমে এসেছে মাত্র ১৫০ মিটার উঁচু প্রায় সমতলভূমিতে।

অসম উপত্যকার পূর্বভাগ জুড়ে খুব আঁকাবাঁকা খাতে বয়ে গেছে ব্রহ্মপুত্র। ডিব্রুগড়ের কাছে ব্রহ্মপুত্র প্রায় ১৬ কিলোমিটার চওড়া আর এখানেই নদীর বুকে গড়ে উঠেছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নদী-দ্বীপ মাজুলি, যার আয়তন প্রায় ৯২৯ বর্গ কিলোমিটার।

ব্রহ্মপুত্রের তীরে গড়ে উঠেছে উত্তর-পূর্ব ভারতের সবচেয়ে বড় শহর গুয়াহাটি। গুয়াহাটির কাছে ব্রহ্মপুত্রের ভেতরে একটি ছোট্ট দ্বীপও

গুয়াহাটির কাছে ব্রহ্মপুত্র নদ। নদীর ওপর দোতলা সেতু। [ছবি ঃ প্রশান্ত গুহ রায়]

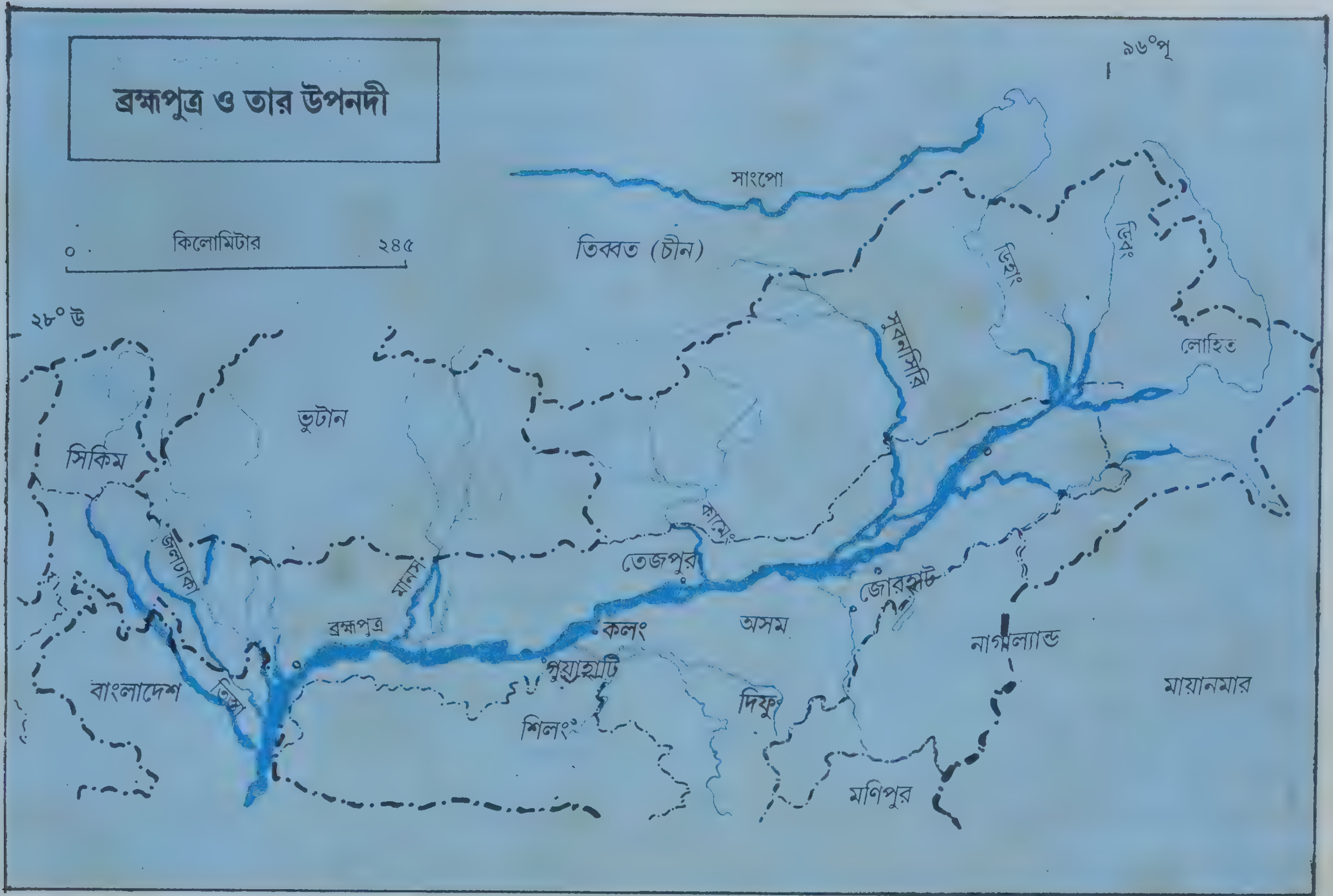

রয়েছে—পিকক দ্বীপ (Peacock island)। গুয়াহাটি শহর থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে নীলাচল পাহাড়ে স্থাপিত হয়েছে বিখ্যাত কামাখ্যা মন্দির। গুয়াহাটির কাছে পাণ্ডুতে ব্রহ্মপুত্রের ওপর একটি দোতলা সেতু বানানো হয়েছে হাল আমলে। এই সেতুর ওপর দিয়ে রেল ও বাস দুই-ই চলাচল করে। ব্রহ্মপুত্রের উত্তর পাড়ে আরেকটি বড় শহর তেজপুর।

উত্তর ও দক্ষিণ দিকে বেশ কয়েকটি উপনদী মিশেছে ব্রহ্মপুত্রে। উত্তরদিক থেকে আসা উপনদীগুলির মধ্যে রয়েছে সুবনসিরি, কামেং বা জিয়া ভরেলি, মানস ও সংকোশ। দক্ষিণ থেকে এসেছে বুড়ি ডিহিং, ধানসিঁড়ি, কোপিলি আর কালাং। আরও কয়েকটি উপনদী আছে যাদের উৎস ভুটান ও সিকিমের বরফঢাকা পাহাড়ে। এই উপনদীগুলি পশ্চিমবঙ্গ পেরিয়ে বাংলাদেশের ভেতরে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিশেছে। এগুলির নাম তিস্তা, জলঢাকা, তোর্সা, কল্যাণী ও রায়ডাক।

মানস

ব্রহ্মপুত্রের সবচেয়ে বড় উপনদ মানসের জন্ম তিব্বতের হিমালয়ের বরফে ঢাকা অঞ্চলে। তাই মানস ও তার উপনদীগুলি সারা বছর ধরে হিমগলা জল পায়। তাছাড়া তিব্বত, ভুটান ও অরুণাচল প্রদেশে যত নদীনালা আছে, তার বেশির ভাগই মানস নদীর খাত বেয়ে মেশে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে। পাহাড় থেকে মানস নদ সমতলে নেমে এসেছে অসমের মোথারগুঁড়ি গ্রামের কাছে। ১৮৯৭ সালে উত্তর-পূর্ব ভারতে যে ভয়ংকর ভূমিকম্প হয়েছিল, তাতে মানসের গতিপথ বদলে গেছে অনেকটাই। হিমালয়ের পায়ের কাছে মানস নদের পাড়ে গড়ে উঠেছে মানস সংরক্ষিত অরণ্য।

ধানসিড়ি

ধানসিড়ি নদীর জন্ম নাগাল্যান্ডের নাগা পাহাড়ে। প্রায় ৩৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই নদীটি ব্রহ্মপুত্রে মিশেছে মাজুলি দ্বীপের কাছে।

তিস্তা

তিস্তা নদীর উৎস সিকিমের হিমালয়ে। তিস্তা কথাটি এসেছে ত্রি-স্রোতা (অর্থাৎ যার তিনটি স্রোত)—এই সংস্কৃত শব্দটি থেকে। এখানে তিনটি স্রোত বলতে বোঝায় পুনর্ভবা, আত্রেয়ী ও করতোয়া। ১৭৮৭ সাল পর্যন্ত তিস্তার জল পড়ত গোয়ালন্দের কাছে পদ্মায়। কিন্তু ঐ বছর তিস্তার বন্যায় নদীর গতিপথ বদলে গিয়ে এটি ব্রহ্মপুত্রের উপনদীতে পরিণত হয়। তিস্তা খুবই তেজী পাহাড়ি নদী। তাই নদীর দু পাশের দেওয়াল খুবই খাড়া।

হিমালয় থেকে তিস্তা সমতলে নেমে এসেছে দার্জিলিং জেলার সেবক গ্রামের কাছে। তারপর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বয়ে গিয়ে বাংলাদেশের রংপুরে ব্রহ্মপুত্রে মিশেছে। তিস্তার একটি বিখ্যাত উপনদী করলা, এরই তীরে জলপাইগুড়ি শহর।

করতোয়া

উত্তরবঙ্গের আর একটি বিখ্যাত নদী করতোয়া। এর উৎস সিকিমের পাহাড়ে। আগে তিস্তার জল আত্রাই, পুনর্ভবা আর করতোয়ার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হত। তিস্তার গতিপথ বদলে গেলে করতোয়া নদী জলপাইগুড়ি জেলার উত্তর-পশ্চিম ভাগ দিয়ে বয়ে গিয়ে আত্রাই নদীতে পড়েছে। তারপর এটি ঢাকা ও পাবনা জেলার সীমান্তে যমুনা নদীতে মিশেছে।

জলঢাকা

উত্তরবঙ্গের আর একটি খামখেয়ালী নদী জলঢাকা। এর উৎস সিকিমের হিমালয় পাহাড়ে।

১৯৬৮ সালে প্রচণ্ড বন্যায় তিস্তা ব্রিজ ভেঙে যায়। [ছবি ঃ দাশ স্টুডিও, দার্জিলিঙ]

অরুণাচল প্রদেশের পাহাড়ি অঞ্চল দিয়ে বয়ে চলেছে কামেং (জিয়া ভরেলি) নদী। এটি ব্রহ্মপুত্রের উপনদী [ছবি ঃ সুব্রত পত্রনবীশ]

বর্ষাকালে পাহাড় থেকে নেমে-আসা জলে প্রচণ্ড ফুলেফেঁপে ওঠে। এই পাহাড়ি নদীর স্রোতকে কাজে লাগিয়ে নির্মিত হয়েছে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। এখান থেকে জলবিদ্যুৎ পাঠানো হচ্ছে উত্তরবঙ্গের বহু জায়গায়। বাংলাদেশের ভেতরে আলিপুরের কাছে জলঢাকা মিশেছে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে।

মেঘনা

মেঘনা নদীকে শুধুমাত্র ব্রহ্মপুত্রের উপনদী না বলে বলা উচিত পদ্মা-যমুনার (ব্রহ্মপুত্র) উপনদী। বাংলাদেশের চাঁদপুরের কাছে মেঘনা এসে মিলিত হয়েছে পদ্মা-যমুনার সঙ্গে। চাঁদপুর বাংলাদেশের একটি বিখ্যাত নদীবন্দর।

মেঘনার সঙ্গে মনে এসে যায় বরাক নদীর নামও। বরাক নদীর জন্ম মিজোরাম ও মণিপুরের পাহাড়ে। বরাক অসমের কাছাড় জেলায় বদরপুরের কাছে এসে দুটি ধারায় ভাগ হয়েছে। এই জলধারা দুটির নাম— সুর্মা ও কুশিয়ারা। সুর্মা নদীর পাড়ে বাংলাদেশের বিখ্যাত জেলাশহর শ্রীহট্ট। এই দুটি নদীই বাংলাদেশের ভেতরে মিশে গেছে মেঘনা নদীর সঙ্গে। এই মিলিত নদীধারার সঙ্গে মেঘালয় ও ত্রিপুরার বেশ কিছু পাহাড়ি নদীও মিশেছে।

আমাজনকে বাদ দিলে নদী হিসেবে মেঘনা বোধ হয় পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৃষ্টির জল বহন করে। কারণ সুর্মা-কুশিয়ারা এবং আরও বেশ কয়েকটি পাহাড়ি নদী খাসিয়া-জয়ন্তিয়া পাহাড় ও চেরাপুঞ্জি অঞ্চলের বৃষ্টির জল বয়ে আনছে।
চেরাপুঞ্জি-মৌসিনরাম অঞ্চলেই তো পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়। এত অফুরন্ত বৃষ্টির জলের জন্য শ্রীহট্ট জেলায় বড় বড় বিলের সৃষ্টি হয়েছে।পাহাড় বেয়ে যখন বৃষ্টির জল নেমে আসে, তখন নদীখাতগুলি তা ধরে রাখতে পারে না। তারই উপছে পড়া জলে নিচু জায়গাগুলিতে তৈরি হয়েছে বড় বড় বিল—এখানকার মানুষরা যাকে বলেন হাওর।

পাগলাদিয়া

পাগলাদিয়ার জন্ম ভুটানের হিমালয়ে। হিমালয়ের পাহাড়ি অঞ্চলে এর উৎস বলে নদী-উপত্যকার আয়তন ছোট। তাই বৃষ্টি হলে নদীর জল নদীখাত উপছে নেমে আসে অসমের সমতলভূমিতে। তাছাড়া সমতলে নেমে আসবার পর পুবদিক থেকে বেশ কয়েকটি উপনদীও এর সঙ্গে মিশেছে। ফলে অসমের কামরূপ জেলায় প্রায়ই বন্যা হয়।

নর্মদা

ছত্তিশগড়ের বিন্ধ্য পর্বতের শীর্ষে খুব ঘন অরণ্যের মধ্যে তীর্থক্ষেত্র অমরকণ্টক। মহাকাল পাহাড়ে প্রায় ১০৫০ মিটার উঁচু এই তীর্থস্থানটি খুবই দুর্গম। এই তীর্থক্ষেত্রের একটি কুণ্ড থেকেই নর্মদার উৎপত্তি। নর্মদার জন্ম নিয়ে একটি পৌরাণিক কাহিনী এইরকম—বিন্ধ্য পর্বতে তখন প্রচণ্ড খরা চলছে। দেবতারা তাই একজোট হয়ে শঙ্করের কাছে প্রার্থনা করলেন। শঙ্করের 'নর্ম' (অর্থাৎ ঘাম) থেকে জন্ম হল এক কন্যার। নাম নর্মদা। দেবাদিদেব শঙ্কর ওকে বর দিয়ে বললেন, তুমি হবে এক পবিত্র নদী।

পুরাণে লেখা ভারতের পবিত্র সপ্তসিন্ধুর মধ্যে এক প্রসিদ্ধ নদী নর্মদা। তখন অবশ্য এর নাম ছিল রেবা। পুণ্যার্জনের দিক থেকে গঙ্গার পরেই নর্মদার স্থান। নর্মদার দুই তীর জুড়ে বহু তীর্থক্ষেত্র—পারাগত, ওঙ্কার, পার্বণী, ওংকারেশ্বর, কর্ণালী, শুক্লতীর্থ, ব্রোচ ইত্যাদি। বিন্ধ্যপর্বতের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে ওংকারেশ্বর মন্দিরের দুপাশ দিয়ে বয়ে চলেছে নদীর জলধারা। ওঙ্কার পর্বতে একটি শিবমন্দির নির্মাণ করেন সূর্যবংশীয় রাজা মান্ধাতা।

ভৌগোলিক দিক থেকেও নর্মদার একটা গুরুত্ব আছে। এই নদীটিকে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সীমারেখা বলে অনেকেই মনে করেন। রাজা হর্ষবর্ধনের রাজ্যের দক্ষিণ সীমানা ও চালুক্যরাজাদের উত্তর সীমানা নির্দেশ করত নর্মদা। আবার মহাভারতের অবন্তী রাজাদের দক্ষিণ সীমানা ছিল এই নদীটি।

বিন্ধ্য পর্বতে গিরিখাত কেটে বয়ে চলেছে পাহাড়ি নদী নর্মদা। কুণ্ড থেকে বেরিয়ে এসে মাণ্ডলা পাহাড় কেটে প্রথম ৩০০ কিলোমিটার পথ তৈরি করে নিয়েছে নর্মদা। ফলে এই অঞ্চলে নর্মদার বুকে সৃষ্টি হয়েছে বহু জলপ্রপাতের। উৎস থেকে প্রায় ৭ কিলোমিটার দূরে আচমকা হাজার দুয়েক ফুট নিচে আছড়ে পড়ে সৃষ্টি করেছে কপিলধারা জলপ্রপাত। আরও কিছুটা দূরে নর্মদার বুকে সৃষ্টি হয়েছে দুগ্ধধারা জলপ্রপাতের। এরপর নর্মদা জব্বলপুরের 'মার্বেল রকস্' পেরিয়ে প্রবেশ করেছে বিন্ধ্য ও সাতপুরা পাহাড়ের মাঝখানে। এখানে ভেরাঘাটের কাছে পুরো নদীটাই প্রায় একশো ফুট নিচে পড়ে দুরন্ত বেগে ছুটে চলেছে। এছাড়া জব্বলপুর থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার উজানে মাণ্ডলা অরণ্যের ভেতরে নর্মদার জলে সৃষ্টি হয়েছে আরেকটি মনোরম জলপ্রপাতের। সহস্রধারায় জল গড়িয়ে পড়ছে বলে এর নাম সহস্রধারা।

মধ্যপ্রদেশের গভীর খাতের ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে দেনোয়া নদী। এটি মিশেছে নর্মদার উপনদী তাওয়ার সঙ্গে [ছবি : অমিতভূষণ দত্ত]

নর্মদা নদের বেশ কয়েকটি বড় উপনদী আছে—বুরনার, বনজার, তাওয়া, হিরণ, ওরসাং ইত্যাদি। দক্ষিণ ভারতের প্রধান নদীগুলি পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়েছে শুধু নর্মদা আর তাপ্তী ছাড়া। ১৩১০ কিলোমিটার দীর্ঘ নর্মদা নদীর ১০৭৮ কিলোমিটার মধ্যপ্রদেশের ভেতরে, বাকিটা গুজরাটে।

মোহনার কাছে নর্মদার চেহারা খাড়ির মতো। প্রায় ২০ কিলোমিটার চওড়া সেই খাঁড়ির পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে ব্রোচ শহর। এখানে নর্মদার পাড়ে ঋষি ভৃগুর শান্ত স্নিগ্ধ আশ্রমও আছে। তাই আগে এর নাম ছিল ভৃগু কচ্ছ। ব্রোচ শহর পেরিয়ে খাঁড়ির জল মিশেছে খামভাট (কাম্বে) উপসাগরে।

তাপ্তী

তাপ্তীর উৎস মধ্যপ্রদেশের বেতুল জেলায় মহাদেও পাহাড়ের পশ্চিমদিকে মুলতাইয়ের মালভূমিতে। উৎস থেকে বেরিয়ে পশ্চিমদিকে বয়ে গিয়ে মধ্যপ্রদেশ ছেড়ে মহারাষ্ট্রের সীমানায় ঢোকে বুরহানপুর শহরের কাছে। প্রায় ৭২৪ কিলোমিটার লম্বা তাপ্তী নদী সমুদ্রে মিশেছে গুজরাটের সুরাট শহরের কাছে। বুরহানপুর ও সুরাট ছাড়া তাপ্তীর পাড়ে আরও কয়েকটি বড় শহর গড়ে উঠেছে। যেমন, মাণ্ডভি, ভুসাওয়াল ইত্যাদি।

তাপ্তী নদীর অনেকগুলি উপনদী—পূর্ণা, ভাগুর, গিরনা, পাঞ্জরা, আনের। তবে এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় পূর্ণা নদী। পূর্ণা নদীর জন্ম গাইলগড় পাহাড়ে। তাপ্তীর সঙ্গে এর সঙ্গম এদালাবাদের কাছে। পূর্ণা খুবই ঐতিহ্যময়ী নদী। এর উল্লেখ রয়েছে পদ্মপুরাণে।

সাবরমতী

সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্রের মতো বড় না হলেও অববাহিকার আয়তনে সাবরমতীও বড় নদীর মধ্যেই পড়ে। ৪১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ সাবরমতীর উৎস রাজস্থানের আরাবল্লী পাহাড়ে। এর শতকরা ৭৫ ভাগ পড়েছে রাজস্থানে, বাকিটা গুজরাটে। উৎস থেকে শুরু করে প্রায় ১৩০ কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত উঁচু

নর্মদার বুকে ধুয়াঁধার জলপ্রপাত। [illegible]

পাহাড়ি জায়গা দিয়ে বয়ে একটি গিরিখাত পেরিয়ে নদীটি নেমে এসেছে সমতলভূমিতে।

গুজরাটের প্রাচীন রাজধানী আমেদাবাদ ও নতুন রাজধানী গান্ধীনগর দুইই দাঁড়িয়ে আছে সাবরমতীর পাড়ে। ১৯১৫ সালে মহাত্মা গান্ধী সাবরমতী নদীতীরে আমেদাবাদ শহরের প্রান্তে গড়ে তোলেন বিখ্যাত সাবরমতী আশ্রম। ১৯৩০ সালে ইংরেজদের তৈরি লবণ আইন অমান্যের ডাণ্ডি পদযাত্রা শুরু হয়েছিল সাবরমতী আশ্রম থেকেই।

সবুজ সমতলভূমি পেরিয়ে সাবরমতী মিশেছে খামভাট (কাম্বে) উপসাগরে। আমেদাবাদ থেকে ৮০ কিলোমিটার দূরে মোহনার কাছে লোথাল-এ হাল আমলে আবিষ্কৃত হয়েছে সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ। 'লোথাল' কথাটি এসেছে 'লোথ' থেকে। গুজরাটি ভাষায় 'লোথ' কথার অর্থ মৃত্যু।

চাষের খেতে জলসেচের জন্য সাবরমতীর বুকে তৈরি হয়েছে বেশ কয়েকটি বাঁধ।

মাহী

৫৩৩ কিলোমিটার লম্বা মাহী নদীর উৎস মধ্যপ্রদেশে বিন্ধ্যপর্বতের এক প্রান্তে। তবে একে পর্বত না বলে মালভূমি বলাই ভালো, কারণ উৎসস্থানের উচ্চতা মাত্র ৫০০ মিটার। মধ্যপ্রদেশ আর রাজস্থান পেরিয়ে গুজরাটের ভেতর দিয়ে খামভাট শহরের পাশ দিয়ে খামভাট (কাম্বে) উপসাগরে পড়েছে নদীটি।

মাহী নদীর বেশ কয়েকটি উপনদী। যেমন, সোম, আনস, পানাম, বিশ্বামিত্র ইত্যাদি। মাহীর উপনদী বিশ্বামিত্রের (ধাধার) তীরে গড়ে উঠেছে বরোদা (এখনকার ভাদোদরা) শহর। শোনা যায়, বিশ্বামিত্র মুনি তপস্যা করেছিলেন এই নদীর তীরে। তাঁরই নামে নদীর নাম।

জলসেচের প্রয়োজনে মাহী নদীর বুকেও এখন বেশ কয়েকটি বাঁধ তৈরি হয়েছে। বেশ কয়েক বছর আগে রাজস্থানের উদয়পুর জেলায় সোম নদীর একটি উপনদীর বুকে জলসেচের জন্য তৈরি হয়েছিল বেশ বড় একটি কৃত্রিম হ্রদ। নাম ধেবর হ্রদ।

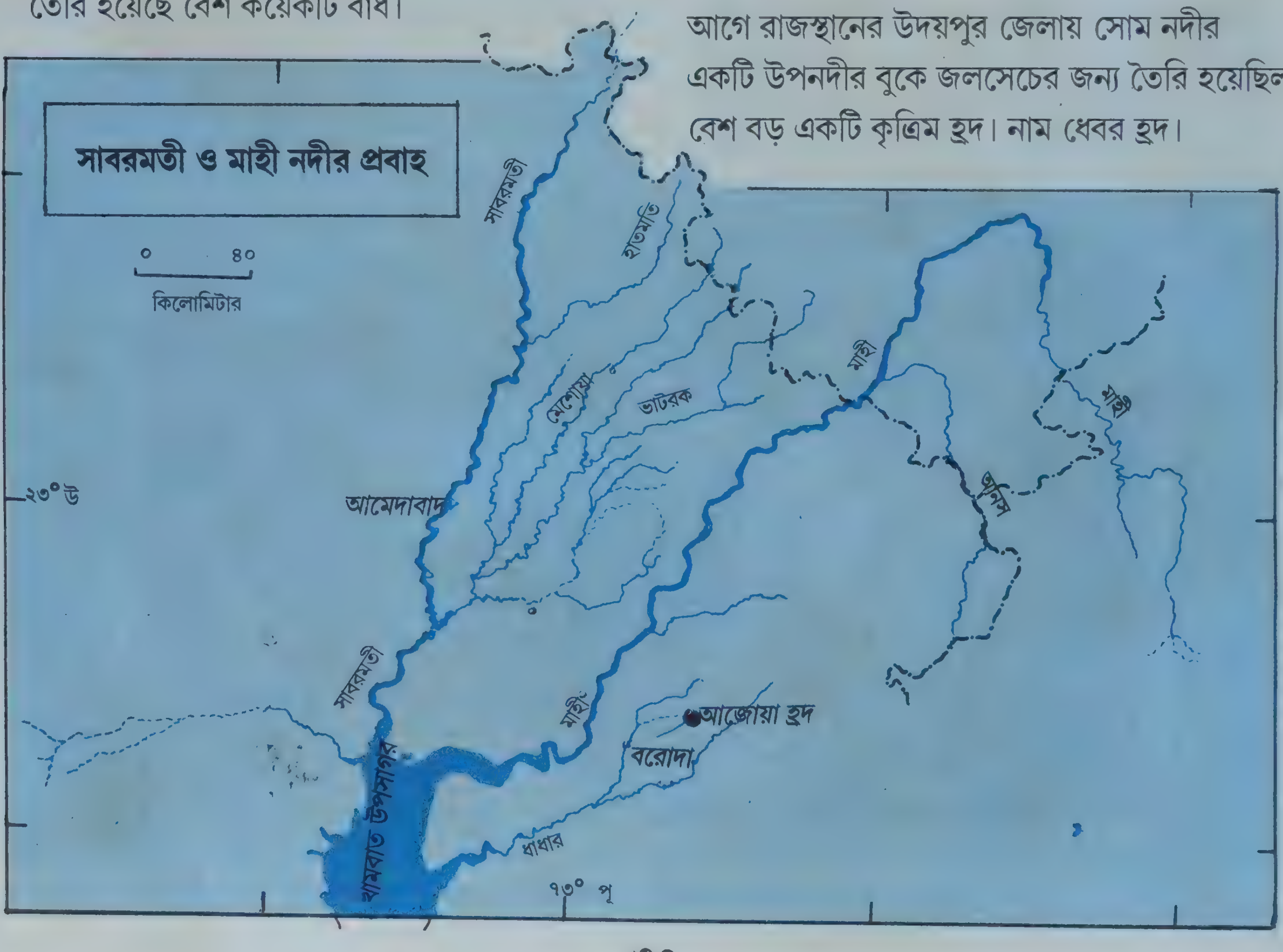

সুবর্ণরেখা

সুবর্ণরেখা নদীর উৎস ঝাড়খণ্ডে, রাঁচির মালভূমিতে হাতিয়ার কাছে। প্রায় ৪৭৭ কিলোমিটার দীর্ঘ এই নদীটি বয়ে গেছে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার ভেতর দিয়ে। সুবর্ণরেখা নাম শুনেই মনে হয় এই নদীতে সুবর্ণ অর্থাৎ সোনা পাওয়া যায়। সত্যিই এই নদীর বালিতে লুকিয়ে আছে সোনার কণা। গ্রামের লোকেরা সারাদিন বালি চালাচালি করে খুঁজে বার করেন সেই সোনার কণা। সুবর্ণরেখার বেশ কয়েকটি উপনদী আছে—খড়কাই, কারফারি, কানাচি, রুরু, করবরি, সনজাই, গাড়া, শঙ্খ, দুলুং ইত্যাদি।

সুবর্ণরেখা নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে ইস্পাত-নগরী জামশেদপুর আর ঘাটশিলার মতো ছোট শহর।

সুবর্ণরেখার বুকে সৃষ্টি হয়েছে অনেক জলপ্রপাত। যেমন, রাঁচি-টাটা রাস্তার কাছে দশম জলপ্রপাত। পাহাড় থেকে জল নেমে আসছে দশটি ধারায়। তাই নাম দশম। রাঁচি শহর থেকে ৪৩ কিলোমিটার দূরে হুড্রু জলপ্রপাত। প্রায় ৩২০ ফুট উঁচু পাহাড় থেকে জলধারা গড়িয়ে পড়ছে নিচে। এখানে একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হয়েছে। হুড্রু থেকে ৩৩ কিলোমিটার আর রাঁচি থেকে ৩৮ কিলোমিটার দূরে নির্জন অরণ্যের ভেতরে আছে গৌতমধারা জলপ্রপাত। প্রায় ১৪০ ফুট উঁচু পাহাড় থেকে রামধনু রঙ সৃষ্টি করে গড়িয়ে পড়ছে জলের ধারা। গৌতমধারা জলপ্রপাতের কাছেই আর একটি জলপ্রপাত—জোনা জলপ্রপাত।

দীঘা থেকে কিছুটা পশ্চিমে ওড়িশার ভেতরে সুবর্ণরেখা মিশেছে বঙ্গোপসাগরে।

ব্রাহ্মণী

দক্ষিণ কোয়েল ও শঙ্খ নদীর মিলনে সৃষ্টি হয়েছে ব্রাহ্মণী নদীর। দক্ষিণ কোয়েল নদীর উৎস রাঁচি মালভূমির ছোট্ট গ্রাম নাগরির কাছে। তবে উৎসস্থল বেশি উঁচু নয়, মাত্র ৬০০ মিটার। শঙ্খনদীর

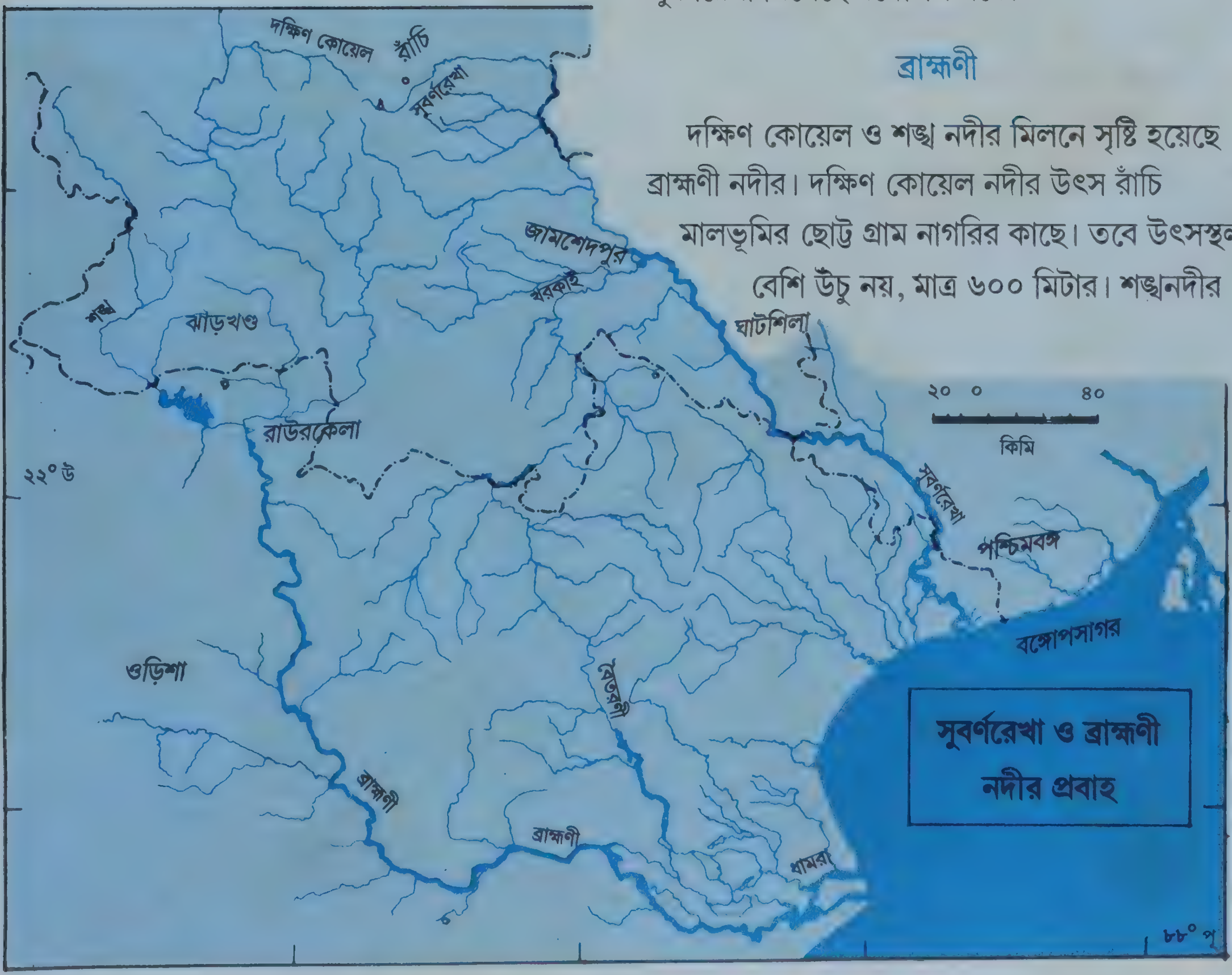

সুবর্ণরেখা ও ব্রাহ্মণী নদীর প্রবাহ

জন্ম বিহার ও মধ্যপ্রদেশের সীমানায় ছোটনাগপুরের মালভূমিতে। শিল্পনগরী রাউরকেলা দাঁড়িয়ে আছে দক্ষিণ কোয়েলের পাড়ে।

রাউরকেলা থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার দূরে ওড়িশার সুন্দরগড় জেলায় দক্ষিণ কোয়েলের সঙ্গে শঙ্খ নদীর মিলন হয়েছে। তারপর থেকে এই মিলিত ধারার নাম ব্রাহ্মণী নদী। প্রায় ৮০০ কিলোমিটার দীর্ঘ ব্রাহ্মণী নদী বঙ্গোপসাগরে মিশেছে হুইলার দ্বীপের কাছে।

মহানদী

৮৫৭ কিলোমিটার লম্বা মহানদীর জন্ম ছত্তিশগড়ের রায়পুর জেলায়, ফরশিয়া গ্রামের এক হ্রদ থেকে। উৎস থেকে বেরিয়ে আসবার পর মহানদী বয়ে চলে উত্তরদিকে। চলার পথে সিউরিনারায়ণের কাছে মহানদীর সঙ্গে মেশে একটি বড় উপনদী। নাম শেওনাথ।

ওড়িশার সম্বলপুরের কাছে হীরাকুঁদে মহানদীর বুকে তৈরি হয়েছে হীরাকুঁদ বাঁধ, যা ভারতের দীর্ঘতম (৪,৮০১ মিটার) তো বটেই, অনেকের মতে এটি পৃথিবীরও দীর্ঘতম বাঁধ।

হীরাকুঁদ বাঁধ পেরিয়ে শোনপুরের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে মহানদী। তারপর উঁচু খাড়া পাহাড় কেটে তৈরি করেছে একটি গিরিখাত। এই সরু অথচ গভীর গিরিখাতটি প্রায় ২৩ কিলোমিটার লম্বা। এই গিরিখাত পেরলে মহানদী পড়ে ওড়িশার সমতলভূমিতে। সেখানে বদ্বীপ সৃষ্টি করে কটক শহরের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়ে মহানদী মিশেছে বঙ্গোপসাগরে।

মহানদী ও এর উপনদী কাটজুরি বয়ে গেছে কটক শহরের দুপাশ দিয়ে। কটকে আগে প্রায়ই বন্যা হত। শহরকে বন্যার হাত থেকে বাঁচাতে কাটজুরি নদীতে বাঁধ দেওয়া হয়েছে।

মহানদীর অনেকগুলি উপনদী। যেমন, হাসদো, মান্দ্, ইব, জংক, ওঙ, তেল ইত্যাদি।

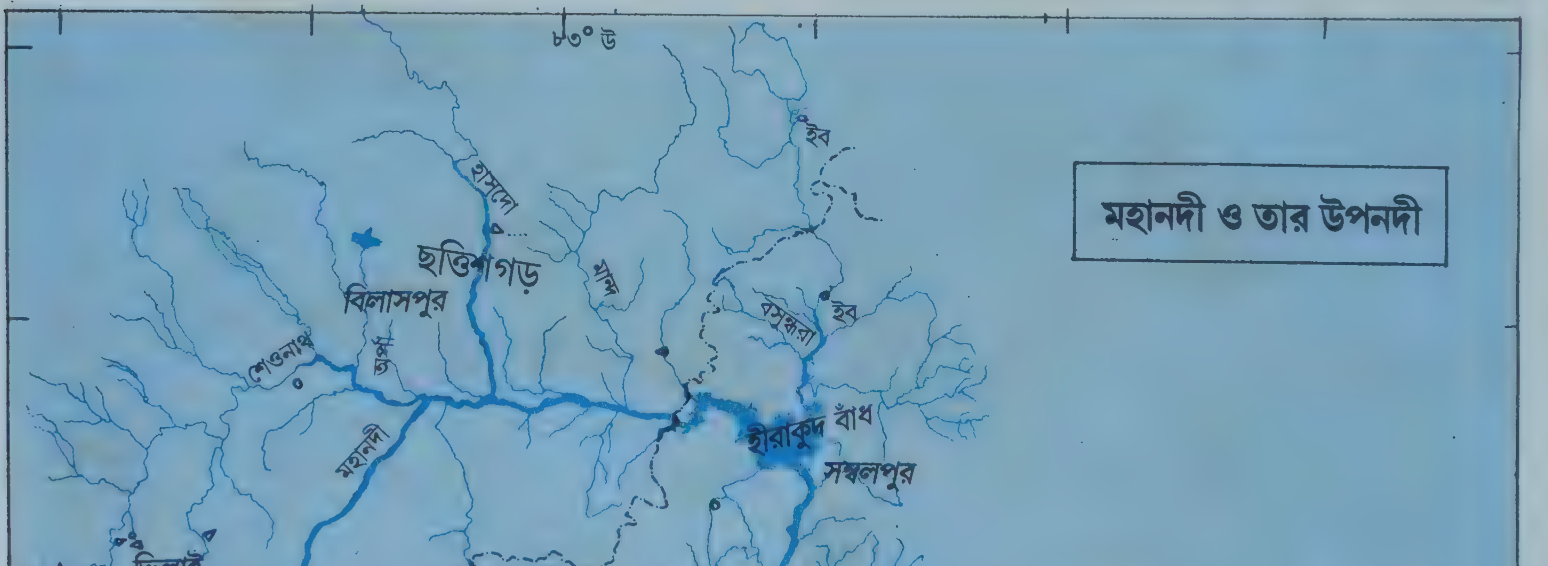

গোদাবরী

পুরাণে যেসব নদনদীর নাম রয়েছে, তার মধ্যে গোদাবরীর নামও আছে। প্রাচীনকাল থেকেই একটি উন্নত সভ্যতা বিকাশলাভ করেছে গোদাবরী নদীর দুই তীর জুড়ে।

গোদাবরীর জন্ম পশ্চিমঘাট পর্বতমালার (যার প্রাচীন নাম সহ্যাদ্রি) পূর্ব ঢালে। মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলার ত্র্যম্বক গ্রামের কাছে ব্রহ্মগিরি পাহাড়ে গোদাবরীর উৎস। ঐ পাহাড়ে নির্মিত ত্র্যম্বকেশ্বর মন্দিরের এক গোমুখ থেকে গোদাবরীর জলধারা বেরিয়ে আসছে।

গোদাবরী নদী নিয়ে একটি কিংবদন্তী আছে। গল্পটা এইরকম। গৌতম মুনি গোদাবরীর জলধারা দেখতে দেখতে হঠাৎ পেছন ফিরলেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই গোদাবরী কোথায় যেন অদৃশ্য হল। কিন্তু মুনি গোদাবরীকে দেখবেনই। তাই মুনির ইচ্ছেয় বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দিয়ে পাহাড় কেটে আবার মুক্ত করলেন গোদাবরীকে।

পশ্চিমঘাট পর্বতের ঢালে গোদাবরীর এক তীরে নাসিক একটি তীর্থস্থান, অন্য তীরে রামায়ণে বর্ণিত পঞ্চবটী। নাসিকে গোদাবরীর তীরে কুম্ভমেলা বসে বারো বছর পরপর। ভক্ত মানুষদের বিশ্বাস, গঙ্গার মতোই গোদাবরীর জল পবিত্র। তাই গোদাবরীর আরেক নাম বৃদ্ধগঙ্গা বা দক্ষিণগঙ্গা। পবিত্রতা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও উপযোগিতার দিক থেকে গঙ্গা ও সিন্ধুর পরই গোদাবরীর স্থান। গোদাবরী নদীর তীরে মহারাষ্ট্রের নানডেড শহর পবিত্র শিখ তীর্থ।

১৪৬৫ কিলোমিটার দীর্ঘ গোদাবরী দক্ষিণ ভারতের সবচেয়ে বড় নদী। পশ্চিমঘাট পর্বতমালা থেকে বেরিয়ে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি পেরিয়ে রাজামহেন্দ্রীর কাছে গোদাবরী দুভাগে বিভক্ত হয়েছে। পুবে গৌতমী গোদাবরী ও পশ্চিমে বশিষ্ট গোদাবরী। এখানেই গোদাবরী নদীর ওপর নির্মিত হয়েছে তিন কিলোমিটার লম্বা ভারতের দ্বিতীয় দীর্ঘতম রেল ও সড়ক সেতু। বঙ্গোপসাগরের মুখে গোদাবরীর মোহনায় সৃষ্টি হয়েছে কয়েকটি ছোট ছোট দ্বীপ।

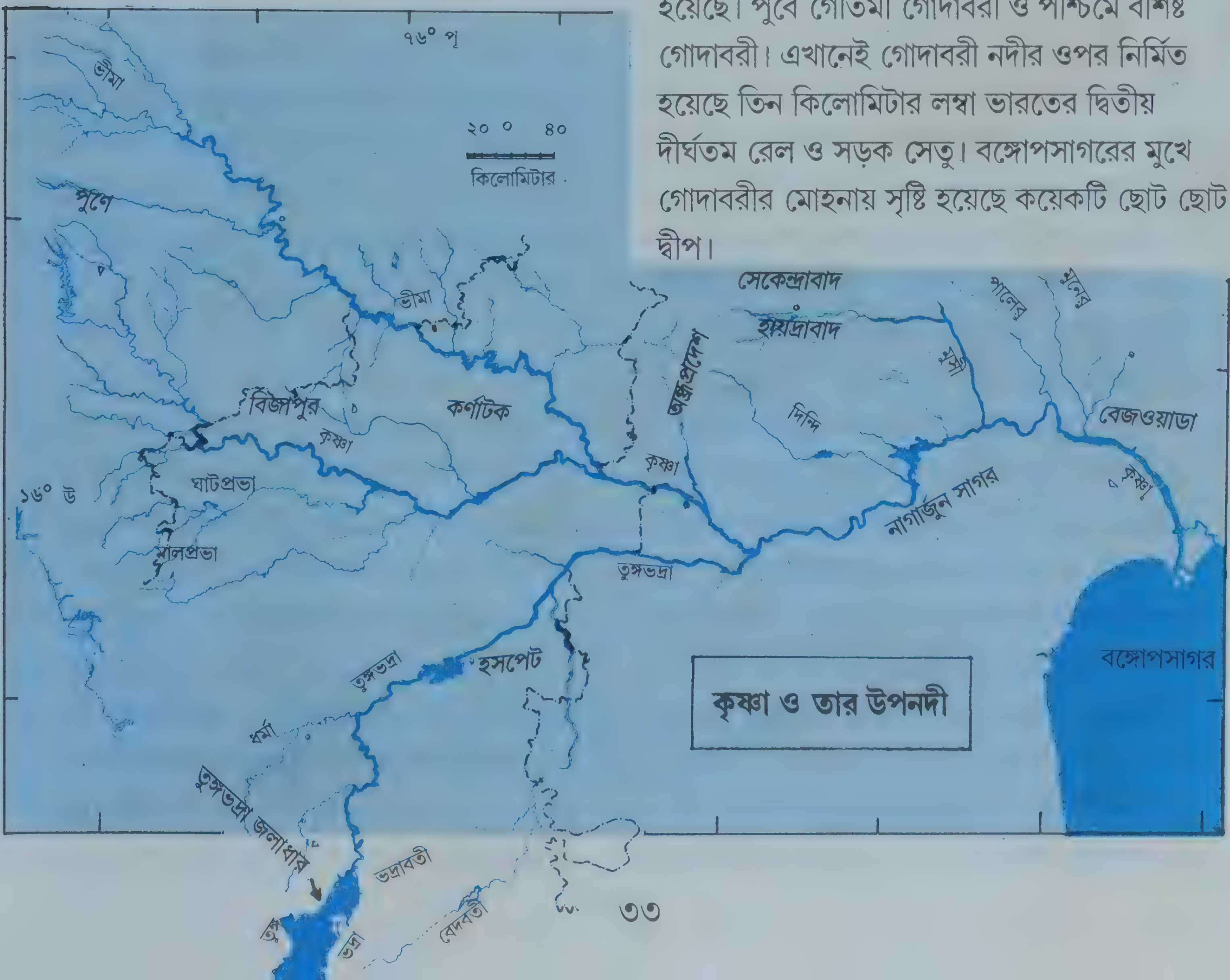

গোদাবরীর অনেক উপনদী—মঞ্জীরা, ওয়েনগঙ্গা, পেনগঙ্গা, ইন্দ্রবতী, পূর্ণা, শবরী, ওয়ার্ধা, প্রভারা, প্রাণহিতা। গোদাবরীর উপনদী ইন্দ্রবতীর বুকে ছত্তিশগড়ের অরণ্যময় বাস্তার জেলায় সৃষ্টি হয়েছে সুন্দর চিত্রকোট জলপ্রপাত (পৃষ্ঠা ১)। বর্ষার সময় আধ কিলোমিটারের বেশি জায়গা জুড়ে প্রায় ৯৬ ফুট নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ইন্দ্রবতী নদী। তারপর ডানদিকে বাঁক নিয়েই মিলেছে গোদাবরীর সঙ্গে।

অনেকদিন ধরেই গোদাবরীর জল চাষবাসের কাজে লাগানো হচ্ছে। ১৮৪৭ সালে স্যার আর্থার কটন নামে এক ইংরেজ সাহেবের পরিকল্পিত 'গোদাবরী ব-দ্বীপ প্রকল্প' চালু করা হয়, যাতে গোদাবরী নদীর জল খালের ভেতর দিয়ে চাষের জমিতে পাঠানো যায়। তেলেঙ্গানা অঞ্চলের বৃষ্টিহীন শুকনো জমিতে জলসেচের জন্য বছর কয়েক আগে গোদাবরীর উপনদী মঞ্জীরায় বাঁধ দেওয়া হয়েছে।

কৃষ্ণা

প্রায় ১৪০০ কিলোমিটার দীর্ঘ কৃষ্ণা নদী দক্ষিণ ভারতের অন্যতম প্রধান নদী। মহারাষ্ট্রের মহাবালেশ্বর শৈলশহরের কাছে কৃষ্ণা নদীর উৎসস্থল। এখানে পঞ্চগঙ্গা মন্দিরের গোমুখ থেকে বেরিয়ে আসছে পাঁচটি জলের ধারা—কৃষ্ণা,বৈষ্ণা , কয়না, সাবিত্রী, গায়ত্রী। এদের মধ্যে কৃষ্ণাই প্রধান। বাকিগুলি উপনদী।

পার্বত্য অঞ্চলে নদীটি খুবই খরস্রোতা। ভীমা নদীর সঙ্গে কৃষ্ণার মিলন হয়েছে কর্ণাটকের রায়চুর জেলায়। আর সেই সঙ্গমস্থানের কিছুটা দূরে কৃষ্ণা নদী নেমে এসেছে অন্ধ্রপ্রদেশের সমতলভূমিতে। কৃষ্ণার একটি বিখ্যাত উপনদী তুঙ্গভদ্রা। তুঙ্গভদ্রার প্রাচীন নাম পম্পা। তুঙ্গভদ্রার তীরে এখনকার হাম্পি শহরই সেই ঐতিহাসিক বিজয়নগর শহর। তুঙ্গভদ্রা একটি নদী নয়, তুঙ্গ আর ভদ্রা—এই দুটি নদীর মিলনে সৃষ্টি হয়েছে তুঙ্গভদ্রার। আর এই দুটি নদীর উৎসই পশ্চিমঘাট পর্বতে, খুবই কাছাকাছি জায়গায়। কিন্তু জন্মের পর দুদিকে বয়ে গিয়ে আলাদা হয়ে যায়। এই দুই নদী পরে আবার মিলিত হয়েছে কর্ণাটকের শিমোগা জেলার কুদলি (কন্নড় ভাষায় কুদলি শব্দের অর্থ সঙ্গম) গ্রামের কাছে। ভদ্রা নদীর তীরে গড়ে উঠেছে বিখ্যাত ইস্পাতনগরী ভদ্রাবতী। জলসেচ ও জলবিদ্যুতের জন্য বেল্লারির কাছে হসপেটে তুঙ্গভদ্রার বুকে বেশ বড় বাঁধ দেওয়া হয়েছে।

কৃষ্ণা নদীর বড় বড় উপনদীগুলি হল—ঘাটপ্রভা, মালপ্রভা, মুসী, পালেরু ও মুনেরু। ঘাটপ্রভা নদীর বুকে ৫২ মিটার উঁচু থেকে জল আছড়ে পড়ে একটি বড় জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়েছে। নাম গোকক জলপ্রপাত।

কৃষ্ণার উপনদী মুসীর তীরে দাঁড়িয়ে আছে অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী, প্রাচীন নবাবী শহর হায়দ্রাবাদ। শোনা যায়, বিখ্যাত পর্যটক মার্কো পোলোও নাকি বেড়াতে এসেছিলেন এই শহরে। হায়দ্রাবাদ শহরকে বন্যার হাত থেকে বাঁচাতে মুসী নদীতে বাঁধ দেওয়া হয় ১৯০৮ সালে। এর ফলে প্রায় ৪৬ বর্গ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে যে কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি হয়, তার নাম ওসমান সাগর। এর নামকরণ হায়দ্রাবাদের নিজাম ওসমান আলি খানের নামে। শহরের পানীয় জলও পাওয়া যাচ্ছে এই কৃত্রিম হ্রদ থেকে।

কাবেরী

গঙ্গা ও গোদাবরীর মতো কাবেরীও ভারতের খুবই পবিত্র নদী। পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় কুর্গ জেলার ব্রহ্মগিরি পাহাড়ের 'টালা কাবেরী' থেকে কাবেরী নদীর সৃষ্টি। এখানকার মানুষের বিশ্বাস, এঁদের আকুল প্রার্থনায় খুশি হয়ে প্রতি বছর অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি, কাবেরী তাঁর জন্মতিথিতে নেমে আসেন মন্দিরের গর্ভগৃহে 'টালা কাবেরীর' ছোট কুণ্ডে। তাই সেই সময় কুণ্ডের জল ফুলে ফেঁপে ওঠে। কখনও বা কুণ্ড ছাপিয়ে জল উপচে পড়ে ভেসে যায়।

কাবেরী নদী। কাপড় কাচা, রঙ করা, কলকারখানার আবর্জনা ফেলায় নদীর জল ক্রমেই দূষিত হয়ে যাচ্ছে। [ছবি ঃ কে গজেন্দ্রন]

হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ পুরাণে যে সপ্তসিন্ধুর (সাতটি নদী) কথা লেখা আছে, তার মধ্যে কাবেরীর নামও রয়েছে। ৮০৫ কিলোমিটার দীর্ঘ কাবেরীর তীরে তীরে গড়ে উঠেছে বড় বড় শহর—তিরুচিরাপল্লী (ত্রিচিনোপল্লী), তাঞ্জোর, সালেম, কুম্ভকোনাম, কোয়েম্বাটুর, সেরেঙ্গাপট্টম, চিত্তুর, লক্ষণতীর্থ, অমরাবতী, ভবানী ইত্যাদি ঐতিহাসিক ও শিল্পনগরী।

কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর সীমান্তে অরণ্য আর পাহাড়ে ঘেরা জায়গায় কাবেরী নদীর বুকে সৃষ্টি হয়েছে শিবসমুদ্রম জলপ্রপাতের। তবে এখানে জলপ্রপাত দুটি। কারণ কাবেরী নদী এখানে দুভাগ হয়ে পাহাড়ি গিরিখাতের ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে গগনচুক্কি আর বরচুক্কি এই দুই শাখানদীতে। প্রায় ৯১ মিটার উঁচু এই দুই জলপ্রপাতের তীব্র জলপ্রবাহকে কাজে লাগিয়ে ১৯০২ সালে নির্মিত হয়েছে ভারতের দ্বিতীয় প্রাচীন জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। এই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি সমস্ত এশিয়ার মধ্যেও প্রাচীন।

কাবেবীর উপনদীগুলির নাম খুবই সুন্দর। যেমন, কর্ণাটকের হারাঙ্গ, হেমবতী, শিংশা, অর্কবতী, লক্ষণতীর্থ, সুবর্ণবতী, তামিলনাড়ুর ভবানী, নয়িল, অমরাবতী ও কেরালার কাবিনি।

তামিলনাড়ুর কাবেরীপত্তনম শহরের কাছে কাবেরী নদী বঙ্গোপসাগরে মিশেছে।

পেন্নার

পেন্নার নদীটি ছোট হলেও এর অববাহিকা নেহাৎ ছোট নয়। ভৌগোলিকরা এটিকে ভারতের বড় নদী বলেই গণ্য করেন। প্রায় ৬০০ কিলোমিটার দীর্ঘ পেন্নার নদীর জন্ম কর্ণাটকের চেন্নাকেশব পাহাড়ে। তবে নদীটির বেশির ভাগ অংশই রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুর, কাড্ডাপা ও নেল্লোর জেলায়। পেন্নার নদী নেল্লোর পেরিয়ে মাইপাড় শহরের পাশে মিশেছে বঙ্গোপসাগরের জলে।

পেন্নার নদীর কয়েকটি উপনদী আছে। যেমন, জয়ামঙ্গলী, কুন্দেরু, সাগিলেরু, চিত্রবতী, পাপাগ্নি, চেয়েরু ইত্যাদি।

নদী যখন মানুষের বন্ধু

অরণ্য পাহাড় সমভূমির ভেতর দিয়ে যে নদী কলকল করে বয়ে যায়, তা শুধু দেখতেই মনোরম নয়, তা যে আমাদের কত কাজে লাগে, সে কথা কে না জানে! জলের গতিশক্তিকে মানুষ তো বহুদিন ধরেই কাজে লাগিয়ে আসছে। জলশক্তির প্রথম ব্যবহার হয়েছে সেদিন, যেদিন কয়েকটি গাছের গুঁড়ি একসঙ্গে বেঁধে নৌকোর মতো নদীতে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া হল এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়। সে নিশ্চয়ই অনেক হাজার বছর আগের কথা।

প্রায় দুহাজার বছর আগে মানুষ তৈরি করেছে জলচাকি। সেচের জন্য নদী থেকে জল তোলার কাজেই ছিল এর ব্যবহার। এই জলচাকি ঘুরত নদীস্রোতের শক্তিতে। এটি প্রথম তৈরি হয় ভূমধ্যসাগরের উপকূলে কোনও দেশে। বোধ হয় খ্রিস্টপূর্ব ১০০ সালে। পরে গম পেষাইয়ের কাজেও জলচাকি ব্যবহার করা হত। রোমান সাম্রাজ্যের আমলে রোম নগরীতে গম পেষাই হত জলচাকি দিয়ে। আরও পরে বারো শতকে সমুদ্র মোহনায় জোয়ার-ভাটার টানেও জলচাকি ঘোরানো হত। শুধু তাই নয়, মধ্যযুগের শেষভাগে আরও হরেক রকম কাজ হতে থাকে জলচাকির সাহায্যে। সতেরো আর আঠেরো শতকে ইংলন্ডে জলচাকির ব্যবহার এত বেড়ে যায়, যে বেকার হওয়ার ভয়ে লোকজনরা হঠাৎ খেপে গিয়ে জলচাকি ভেঙে ফেলতে শুরু করে।

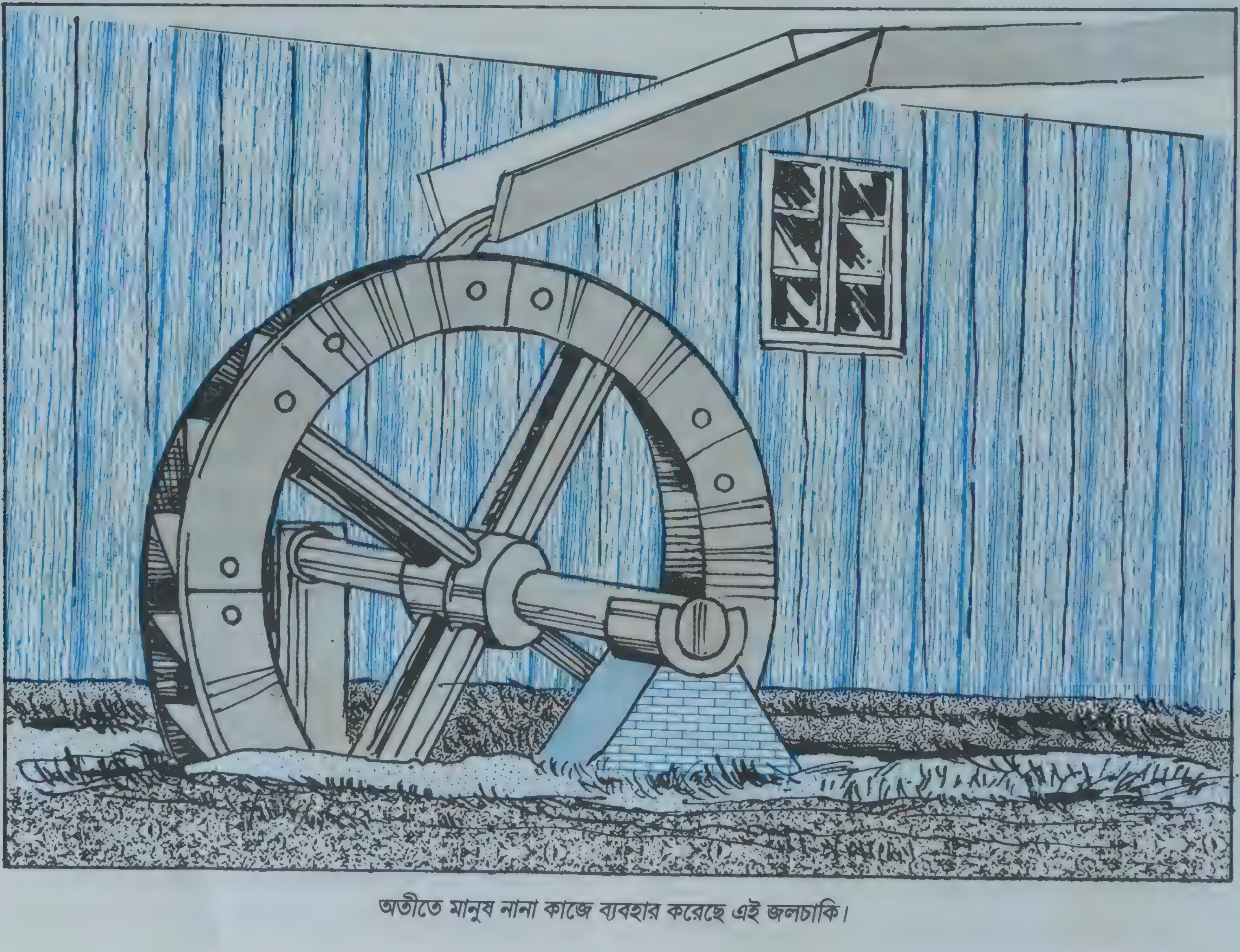

অতীতে মানুষ নানা কাজে ব্যবহার করেছে এই জলচাকি।

জলবিদ্যুৎ

নদীর জলকে খুব ভালোভাবে কাজে লাগানো যায় জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে। পাহাড়ি জায়গায় উঁচু থেকে নিচুতে বয়ে যাওয়ার সময় জলের যে গতি বেড়ে যায়, সেই গতিশক্তিকে কাজে লাগিয়েই উৎপন্ন হয় জলবিদ্যুৎ। উঁচু পাহাড়ি জায়গায় জলাধার বা কৃত্রিম হ্রদ তৈরি করে যে জল আটকে রাখা হয়, তা নলের ভেতর দিয়ে নিচে নামবার সময় টারবাইন ঘোরায়। টারবাইনের ধাক্কায় জেনারেটর ঘুরলে সৃষ্টি হয় বিদ্যুৎ শক্তি। শুধু ভারতে নয়, পৃথিবীর অনেক দেশেই এভাবে উৎপন্ন হয় জলবিদ্যুৎ শক্তি।

১৮৯৭ সালে ভারতে প্রথম জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়। দার্জিলিঙের সেই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্ষমতা ছিল মাত্র ৩০০ কিলোওয়াট। এরপর ১৯০২ সালে কর্ণাটকের শিবসমুদ্রমে স্থাপিত হয় ভারতের দ্বিতীয় জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি। তারপর থেকে ভারতে বেশ কয়েকটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এদের মধ্যে পঞ্জাবের ভাক্‌রা নাঙ্গাল (শতদ্রু নদী), উত্তরপ্রদেশের ওবরা (রিহন্দ্ নদী), ঝাড়খণ্ডের তিলাইয়া (বরাকর নদী), মাইথন (বরাকর নদ), পাঞ্চেত (দামোদর নদ), পশ্চিমবঙ্গের জলঢাকা (জলঢাকা নদী), ওড়িশার হীরাকুঁদ (মহানদী), অন্ধ্রপ্রদেশের নাগার্জুন সাগর (কৃষ্ণা নদী), কর্ণাটকের সারাবতী (সারাবতী নদী) ও মহাত্মা গান্ধী (যোগ জলপ্রপাত), গুজরাটের উকাই (তাপ্তী নদী), মধ্যপ্রদেশের গান্ধীসাগর (চম্বল নদ), জম্মু-কাশ্মীরের সালাল (চেনাব নদী), রাজস্থানের রানাপ্রতাপ সাগর ও জওহর সাগর (চম্বল নদ) ইত্যাদি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে প্রচুর জলবিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে।

যেসব নদীতে জোরালো জোয়ার আসে, সেসব নদী থেকেও অনায়াসে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। এ কাজে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন এলাকায় হুগলি নদীর নাম বলা যেতে পারে। সুন্দরবনের কোনও কোনও জায়গায় জোয়ার-ভাটায় উচ্চতার পার্থক্য দেড় থেকে পাঁচ মিটার পর্যন্ত হয়। জোয়ার-ভাটার এই পার্থক্যকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব কি না, সে বিষয়ে সমীক্ষা করছেন সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ।

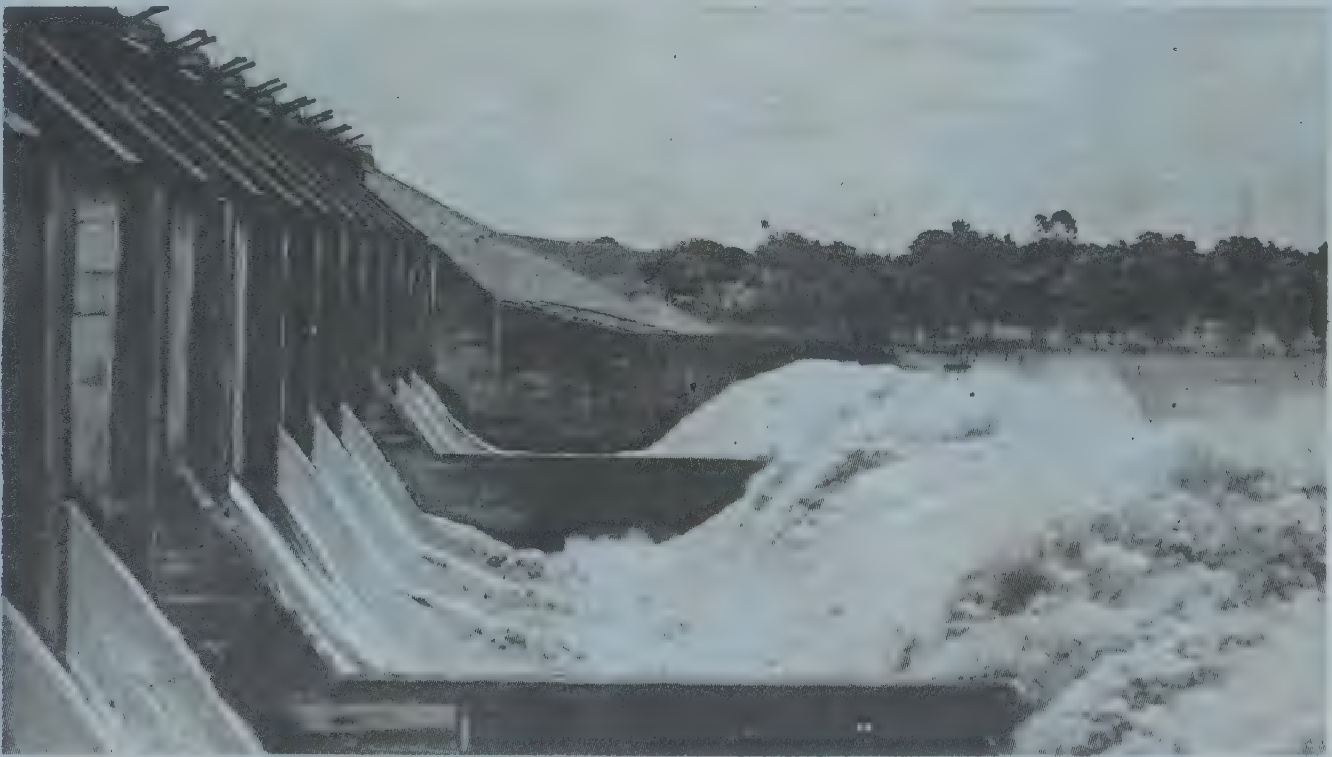

পাঞ্চেত বাঁধ (দামোদর) [ডি. ভি. সি.-র সৌজন্যে]

জলসেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ

ভারতের মতো বিশাল দেশে জলবায়ুর বৈচিত্র্য থাকবেই। এখানে কোথাও অতিবৃষ্টি, আবার কোথাও বা অনাবৃষ্টি। তাই অতিবৃষ্টির জায়গায় প্রায়ই দেখা যায় বন্যা, আর অনাবৃষ্টির জায়গায় খরা। ভারতে জলের সবচেয়ে বেশি ব্যবহার কৃষিতে, কারণ এই কৃষিই জোগাচ্ছে আমদের জীবন ধারণের ফসল। চাষবাসের কাজ ঠিকঠাকভাবে করার জন্য জমিতে জলসেচ না করলে চলে না। ভারতে কূপ, নলকূপ ও পুকুর থেকে জলসেচ করা হলেও নদী থেকে খাল কেটেই সবচেয়ে বেশি জলসেচ হয়, কারণ এভাবে একই সঙ্গে অনেক জমিতে কম খরচে জলসেচ করা সম্ভব।

যে কটি প্রাকৃতিক বিপর্যয় আছে, তার মধ্যে বন্যাই বোধহয় মানুষের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে। কিন্তু বন্যা হয় কেন? বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, নদীখাতের ভেতর দিয়ে যতটা জল ধীরে সুস্থে বয়ে যেতে পারে, তার চেয়ে বেশি জল এলে খাত থেকে জল উপচে পড়ে বন্যা হবে নদীতে। তবে বন্যার তীব্রতা কেমন হবে, তা অবশ্য নির্ভর করে কতদিন ধরে বৃষ্টি হয়েছে, কতটা বৃষ্টি হয়েছে, আশেপাশের পরিবেশ কেমন—এসব নানা প্রাকৃতিক কারণের ওপর। তবে বন্যা যে সবসময় শুধুই ধ্বংস নিয়ে আসে, তা নয়। কোথাও কোথাও বন্যা আশীর্বাদের মতো। আফ্রিকার নীলনদের কথাই ধরা যাক। নীলনদের বন্যায় জলের সঙ্গে বয়ে আনা উর্বর পলিমাটিতে সুদান ও মিশরের এক বিরাট অঞ্চল আজ উর্বর প্লাবনভূমি। সবুজ ফসলে ভরা চারিদিক। বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ও জলসেচের জন্য নীলনদের ওপর অনেকগুলি বাঁধও বানানো হয়েছে। এসব বাঁধের জলে বহুদূরের কৃষিখেতগুলিতে জলসেচ করে চাষবাসের জমি বাড়ানো যাচ্ছে।

বন্যায় ভাসছে গ্রামের পর গ্রাম।

নদী-পরিবহন

একথা আজ সকলেরই জানা, সভ্যতার ইতিহাসে স্থলযানের চেয়েও আগে আবিষ্কৃত হয়েছে জলযান। নদী-নালা বেয়ে মানুষ চলে গেছে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়। প্রথমে খাবারদাবারের খোঁজে, পরে ব্যবসা বা অন্য কোনও কাজে। প্রযুক্তিবিদরা হিসেব কষে দেখেছেন, সড়ক ও রেল পরিবহনের চেয়ে নদী পরিবহন অনেক সস্তা। তবু ভারতে নদী-পরিবহনের ব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি।

ভারতে নদী ও খাল মিলিয়ে মোট নাব্য জলপথ প্রায় ১৫ হাজার কিলোমিটার লম্বা। কিন্তু পলি জমে যাওয়ায় এই জলপথের অনেকটাই কাজে লাগানো যায় না। একটা হিসেব থেকে জানা গেছে, এই জলপথের মধ্যে কেবলমাত্র ২৫০০ কিলোমিটার পথে স্টিমার চালানো যায়, বাকিটা আপাতত শুধু নৌকো চালানোর উপযোগী।

এক সময় যেসব নৌকা গঙ্গায় দেখা যেত। [ছবি ঃ এশিয়াটিক সোসাইটি মেমোয়ার্স]

কেরালার উপকূলভাগে নদীগুলিতে প্রচুর নৌকা চলাচল করে।

নবদ্বীপের কাছে গঙ্গার ফেরিঘাট। এটি ব্যবহৃত হচ্ছে নৌ পরিবহণ ও স্নানের প্রয়োজনে। [ছবি ঃ ড. কুমারজ্যোতি নাথের সৌজন্যে]

মাছ চাষ

প্রতিদিন ভাতের সঙ্গে মাছ না হলে আমাদের অনেকেরই মুখ ভার হয়। মাছের মধ্যে প্রোটিন যথেষ্ট আছে। তাই নদী-নালা-হ্রদে মাছচাষ খুবই প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।

মাছ পাওয়া যায় স্থলভাগের লাগোয়া সমুদ্র, খাঁড়ি ও নদনদী থেকে। কিছু কিছু মাছ যেমন, স্যামন ও ইল ডিম ছাড়ার জন্য সমুদ্র থেকে নদীতে ঢোকে। ভারতেও ইলিশ মাছ মোহনা অঞ্চল ছেড়ে নদীর অনেকটা ভেতরে চলে আসে ডিম ছাড়বার সময়। তাই মাছের যাতায়াতে যাতে কোনও অসুবিধে না হয়, সেজন্য নদীর জলকে সবসময় পরিষ্কার দূষণমুক্ত রাখা দরকার। নাহলে নদীর ভেতরে এ ধরনের মাছের সংখ্যা কমে যাবে।

মাছ চাষের জন্য ঝিল বা জলাশয়ে অসংখ্য মাছের ভেড়ি আছে। তাছাড়াও বহু নদনদীতে প্রতিদিন প্রচুর মাছ ধরা পড়ে। সিন্ধু ও তার উপনদীগুলির যতটা ভারতের মধ্যে পড়েছে, তার মধ্যে বাদামি রঙের ট্রাউট মাছই ধরা পড়ে বেশি। তবে ভারতীয় নদনদীর মধ্যে গঙ্গা নদীতেই সবচেয়ে বেশি মাছ পাওয়া যায়। যেমন, মহাশোল, বাটা, পারসে, ইলিশ ইত্যাদি নানা স্বাদের মাছ। ব্রহ্মপুত্র নদেও নানা ধরনের মাছ আছে। হুগলির মোহনায় সুন্দরবন অঞ্চলে প্রচুর বাগদা, গলদা চিংড়ি ধরা পড়ে। আজকাল এই মাছ বিদেশে রপ্তানি করে বেশ কিছু বিদেশি মুদ্রা আয় করছে ভারত।

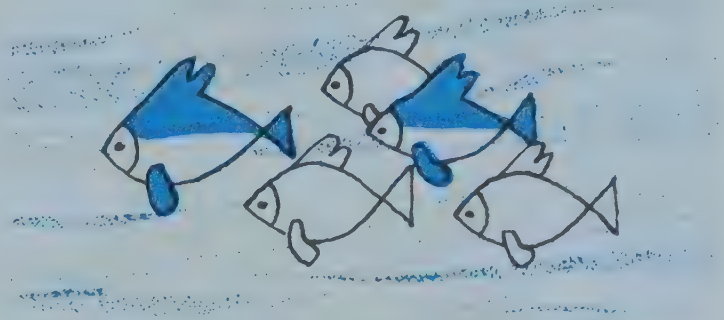

মাতলা নদীতে মাছ ধরার নৌকা। [ছবি : মিহির মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে]

নদীজল দূষণ

কারখানার দূষিত জল, শহরের জঞ্জাল আবর্জনা ইত্যাদি ক্রমাগত নদীতে ফেলবার ফলে গঙ্গা, যমুনা, দামোদর, হুগলি ইত্যাদি নদীর জল অনেকটাই দূষিত হয়ে পড়েছে। এসব নদীতে লোক কাপড় কাচে, চান করে। ফলে বহু লোক নানা ধরনের চর্মরোগ ও অন্যান্য নানা অসুখ বিসুখে ভুগছে। বহু জায়গায় এসব নদীর জলই পানীয় জলের উৎস। যদিও পরিশোধন করে এই জল পানীয় হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তবু জলের মধ্যে ফেনলের মতো অনেক বিষাক্ত রাসায়নিক থেকে যায়। যেহেতু বহু মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে গঙ্গা নদী, তাই গঙ্গা ও তার উপনদীগুলিতে দূষণরোধের জন্য 'সেন্ট্রাল গঙ্গা অথরিটি' নামে একটি সরকারি সংস্থা গঠিত হয়েছে।

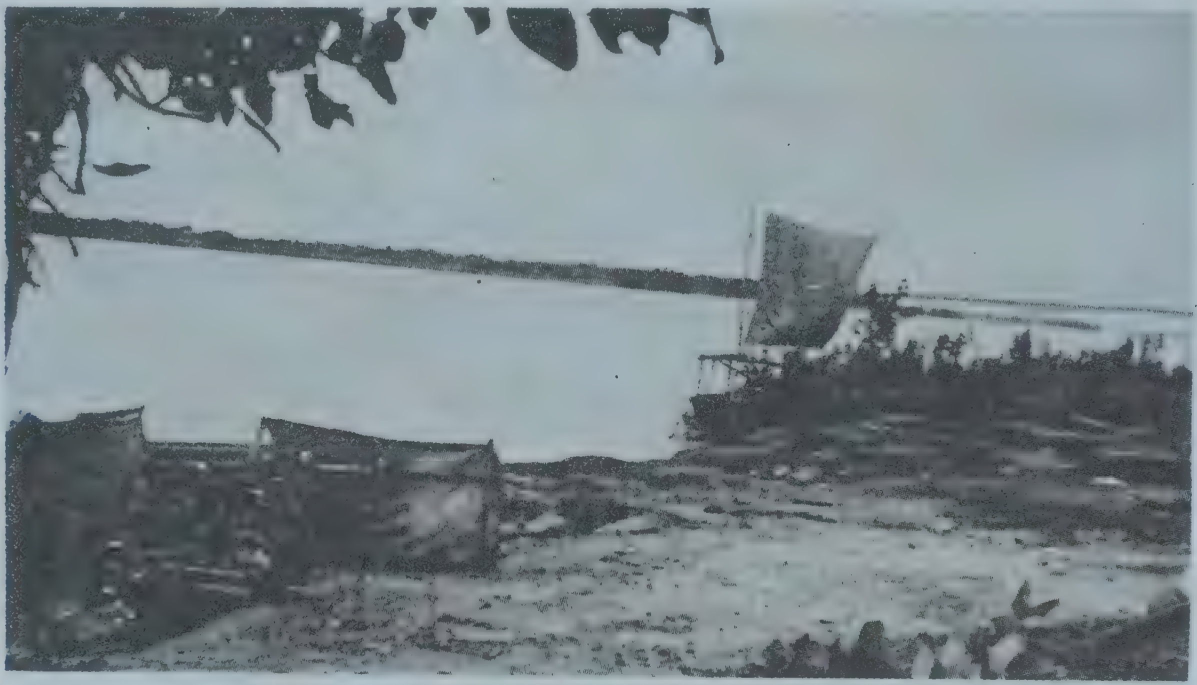

নবদ্বীপের কাছে গঙ্গার পাড়ে শ্মশানঘাট। নদীর জল দূষিত হচ্ছে। [ছবি : ড. কুমারজ্যোতি নাথের সৌজন্যে]

কানপুরের কাছে নর্দমার জল গঙ্গায় মিশেছে। [ছাব : গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান; ভারত সরকার]

রাইন নদীর ওপরে ব্রিজ ফ্রান্স ও জার্মানিকে যুক্ত করেছে। [ছবি ঃ ডঃ মণীন্দ্র মুখোপাধ্যায়]

পৃথিবীর কয়েকটি বড় নদী

নাম (দেশ/মহাদেশ)	দৈর্ঘ্য (কিমি)	অববাহিকার আয়তন (বর্গ কিমি)
নীলনদ (আফ্রিকা)	৬,৬৮৮	৪৬,৪০,০০০
আমাজন (দক্ষিণ আমেরিকা)	৬,৪৪৭	৬৯,৬৮,৩২০
মিসিসিপি-মিসৌরি (উত্তর আমেরিকা)	৬,২১০	৩১,৮৩,৮৭০
ইয়াংসি কিয়াং (চীন)	৫,৮০৫	১৯,৩৬,৬৩৫
ওব-ইরটিশ (রাশিয়া)	৫,৫৬৮	২৬,৯৬,০৬০
হোয়াংহো (পীত নদী) (চীন)	৪,৬৫০	১২,৪৫,৪০৫
কঙ্গো (আফ্রিকা)	৪,৬৩০	৩৬,৪৮,০০০
লেনা (রাশিয়া)	৪,২৬৮	২৩,৯৬,৯১০
ম্যাকেনজি (কানাডা)	৪,২৪০	১৭,৪৫,৯২০
নাইজার (আফ্রিকা)	৪,১৮৩	১৪,৮৪,৮০০
মেকং (দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া)	৪,১৮০	৭,৯৫,০০০
আমুর-কেরুলেন (মঙ্গোলিয়া, চীন ও রাশিয়া)	৪,১০৬	১৯,৪০,৪৮০
ইনেসি (রাশিয়া)	৩,৯৯৮	২৬,৭৫,৬৪৫
রিয়ো ডি লা প্লাটা (দক্ষিণ আমেরিকা)	৩,৭৮০	৪২,৯৯,৬১০
মারে-ডার্লিং (অস্ট্রেলিয়া)	৩,৭৫০	১৫,০০,০০০
ভোলগা (রাশিয়া)	৩,৭২০	১৩,৬৪,০১৫
সেন্ট লরেন্স (উত্তর আমেরিকা)	৩,০৫৭	৭,৪৪,৯৬০
ব্রহ্মপুত্র (এশিয়া)	২,৯০০	৯,২৪,১৬০
সিন্ধুনদ (ভারত-পাকিস্তান)	২,৯০০	৯,৫২,৩২০
ড্যানিয়ুব (মধ্য ইউরোপ)	২,৮৫৮	৮,০৭,৫৩৫
সালুইন (বর্মা/মায়ানমার)	২,৮২০	১,৬০,৫০০
জাম্বেসি (আফ্রিকা)	২,৭৩৫	১৩,১৪,৫৬০
গঙ্গা (ভারত)	২,৫৪০	৮,৬১,৪০৪
ওরিনোকো (ভেনেজুয়েলা)	২,০৬১	৮,৯৬,০০০

টেমস নদীর পারে লণ্ডন শহর।

পৃথিবীর বড় বড় শহরগুলি (বিদেশি) কোন নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে

শহর (দেশ)	নদী
ওয়াশিংটন (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)	পটোম্যাক
নিউ ইয়র্ক (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)	হাডসন নদীর মোহনায়
সানফ্রান্সিসকো (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)	সান জোয়াকিন-স্যাক্রামেন্টো নদীর মোহনায়
মনট্রিল (কানাডা)	সেন্ট লরেন্স
অটোয়া (কানাডা)	অটোয়া
বুয়েনস এয়ার্স (আর্জেন্টিনা)	পারানা নদীর মোহনায়
স্যান্টিয়াগো (চিলি)	মাপোচি
প্যারিস (ফ্রান্স)	সিন
বন (জার্মানি)	রাইন
বার্লিন (জার্মানি)	স্প্রি
লিসবন (পর্তুগাল)	ট্যাগাস নদীর মোহনায়
রোম (ইটালি)	টাইবার
বুডাপেস্ট (হাঙ্গেরি)	ড্যানিয়ুব
লন্ডন (ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য)	টেমস্

শহর (দেশ)	নদী
ওয়ারশ (পোল্যান্ড)	ভিস্টুলা
প্রাগ (চেকোস্লোভাকিয়া)	ভ্লাটাভা
বেলগ্রেড (সার্বিয়া/যুগোস্লাভিয়া)	ড্যানিয়ুব
ভিয়েনা (অস্ট্রিয়া)	ড্যানিয়ুবের উপনদী
লেনিনগ্রাড (রাশিয়া)	নেভা
বেইজিং (চীন)	পেই হো
রেঙ্গুন (মায়ানমার/বার্মা)	ইরাবতী
হ্যানয় (ভিয়েতনাম)	রেড
নম-পেন (কাম্পুচিয়া)	মেকং
ব্যাংকক (থাইল্যান্ড)	মেনাম চাও ফ্রায়া
বাগদাদ (ইরাক)	টাইগ্রিস
কায়রো (ইজিপ্ট)	নীলনদ
খার্তুম (সুদান)	নীলনদ
কিনসাসা (জাইর)	জাইর (কঙ্গো)
মেলবোর্ন (অস্ট্রেলিয়া)	ইয়ারা
মস্কো (রাশিয়া)	মস্কো

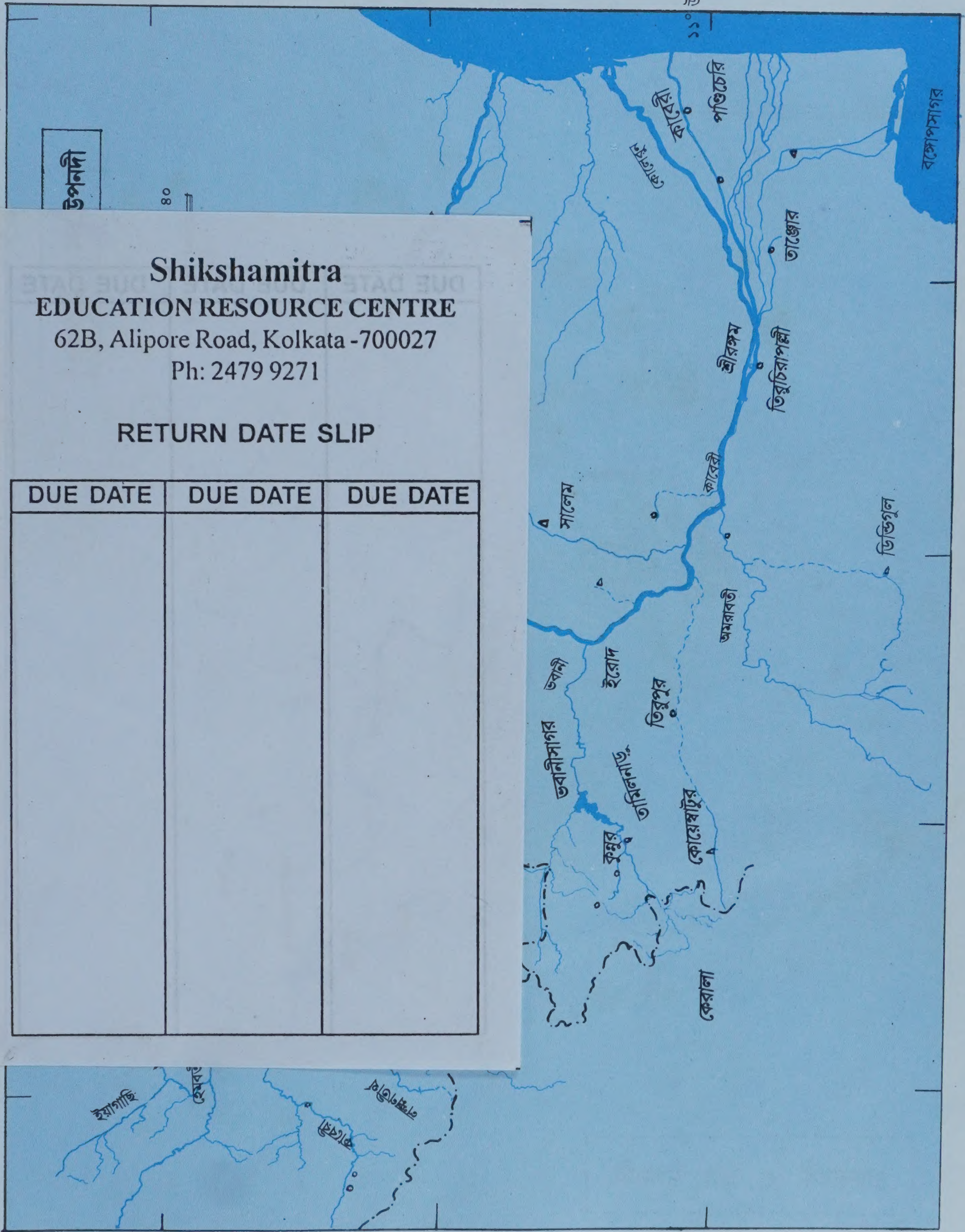

Shikshamitra
EDUCATION RESOURCE CENTRE
62B, Alipore Road, Kolkata -700027
Ph: 2479 9271

RETURN DATE SLIP

DUE DATE	DUE DATE	DUE DATE

জানা অজানার নানান বই

অনিমেষকান্তি পাল
জলযানের ইতিহাস
আকাশযানের কথা

জিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
আকাশভরা সূর্য তারা

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
ভূমিকম্প
নদী

কালীচরণ দাস
গ্রহের নাম পৃথিবী

সমীর রক্ষিত
গুহা থেকে স্কাইস্ক্রেপার

প্রবোধচন্দ্র সেন
সভ্যতার ইতিহাস

সাধনা মুখোপাধ্যায়
বারোমাসের কথা

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

এই গ্রন্থের লেখক দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পেশায় ভূতাত্ত্বিক। চাকরিসূত্রে ছিলেন জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ায়। জন্ম ১৯৪০ সালে ঢাকায়। কিন্তু কলকাতায় পড়াশোনার সময় থেকেই যুক্ত আছেন লেখালেখির সঙ্গে। ছোটোদের জন্যে গল্প, উপন্যাস রচনা ছাড়াও বিজ্ঞান নির্ভর লেখাতেই তিনি আনন্দ পান বেশি। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান রচনার জন্য ১৯৯০ সালে লাভ করেছেন 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পুরস্কার।' ছোটোগল্পের জন্য 'বাংলার বাতায়ন' পুরস্কারেও ভূষিত হয়েছেন তিনি। বর্তমানে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপক। ড. গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য পুরস্কার পেয়েছেন ২০০২ সালে।

নদী আর নদী। মানুষের সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী জুড়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলার এখনও যেন জুড়ি নেই নদীর। মেসোপটেমিয়া থেকে মিশর, সিন্ধু থেকে আজকের কলকাতা, মানুষের সভ্যতার সেই প্রথম সঙ্গী নদী। নদীর ধারেই সার্থক হয়েছে মানুষের স্বপ্ন। সফল হয়েছে তার বাণিজ্য, তার বন্দর। তবু দেশে দেশে এক এক নদীর এক এক রকম নাম। মানস সরোবরের কাছে অসমের যে ব্রহ্মপুত্রনদ—তিব্বতে তারই নাম সাংপো, অরুণাচলে ডিহং। কিন্তু বাংলাদেশে সেই নদীরই নাম যমুনা। তেমনই সব চেনা গঙ্গা, গোদাবরী, কাবেরী, কৃষ্ণা, সুবর্ণরেখা, তিস্তা, তোর্সা, জলঙ্গী, কংসাবতী, কর্ণফুলি, কিংবা কোপাই আর দামোদর নদের কথাই এই গ্রন্থে লেখা হয়েছে সহজ করে। সঙ্গে আছে নদী থেকে উৎপন্ন জলবিদ্যুৎ আর জলসেচের কথাও। সব শেষে পৃথিবীর বিখ্যাত নদ-নদীর নামের তালিকা।

মূল্য : টাকা ৪০.০০ মাত্র   তৃতীয় মুদ্রণ : এপ্রিল ২০০৪   ISBN 81-85626-44-8